সন্দেশ

এই সংখ্যায় শুরু হল

সত্যজিৎ রায়ের অজানা উপন্যাস

চলবে টানা ২ বছর!

সম্পাদক

সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

এপ্রিল ২০০৬

১০ টাকা

Hard Copy, Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

আজকাল প্রকাশন-এর

খেলা

এখন পাক্ষিক অন্যরকম চেহারায়

দেশ-বিদেশের খেলাধুলোর খবর
তারকাদের রঙিন ব্লো-আপ।
আকর্ষণীয় ফিচার।
বিষয়-বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

৮ টাকায় ৪৮ পাতা

সন্দীপ রায় ও সুজয় সোম সম্পাদিত ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

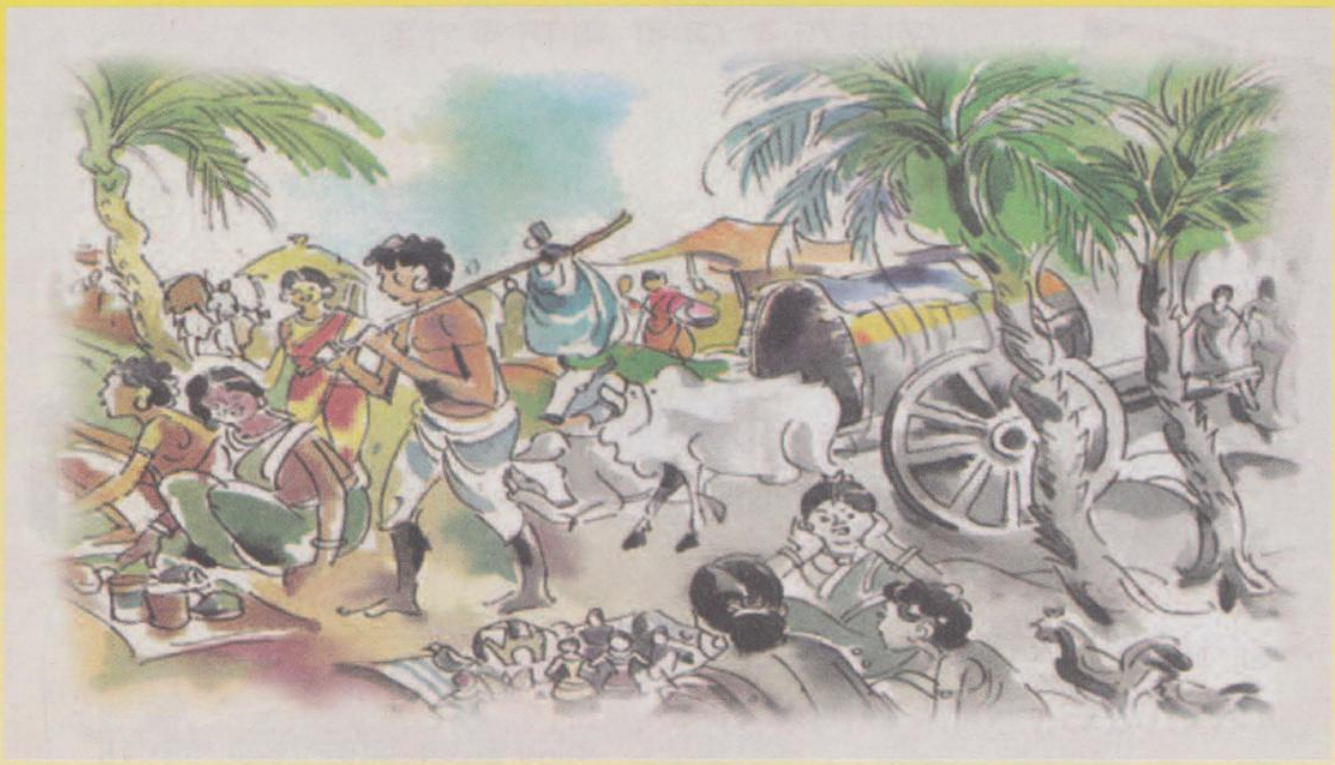

আহ্লাদে আটখানা! সব্বাই!

ঘরে বসেই 'সন্দেশ' নাও • যে-কোনও মাস থেকে এক বছরের গ্রাহক-চাঁদা

ক ল কা তা য় কুরিয়ার মারফত ২০০ টাকা

ক ল কা তা র বা ই রে

শারদীয় সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে, অন্য সংখ্যা সাধারণ ডাকে ২০০ টাকা

সব সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে ৪০০ টাকা

শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট বা মানি অর্ডার-এ, কিম্বা ডাকযোগে 'সন্দেশ'-এর নামে অ্যাকাউন্টপেয়ি চেক-এ চাঁদা পাঠাও 'সন্দেশ'-এর নতুন ঠিকানায়

কলকাতার বাইরের চেক দিলে ভাঙাবার খরচ ৫০ টাকা লাগবে

স ন্দে শ ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০

ফোন • সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩

ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮

ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

সন্দেশ

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১২। চৈত্র ১৪১২ এপ্রিল ২০০৬

বিশেষ রচনা

আশিসকুমার ঘোষ কিন্নরদেশের গভীরে ৩৩
নবনীতা দেব সেন হিং টিং ছট ৪৬
শঙ্খ ঘোষ অল্পবয়স কল্পবয়স ৬৫
সুনীত সেনগুপ্ত জটায়ু জিন্দাবাদ! ৬৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

শৈলেন ঘোষ ঝুংরিটুং ১৬
সত্যজিৎ রায় • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
অবতার ৫০
বুদ্ধদেব গুহ ফোটা কার্তুজের গন্ধ ৮৬

গল্প

অনিরুদ্ধ দেব আকাশছোঁয়া গাছ ২৪
সঞ্জয় সিংহ ঝরা পাতা ৬২
হেমেন্দুশেখর জানা
ঘাটের ঘুম মাঠের ঘুম ৭৬

ছড়া ও কবিতা

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
লিখিনু মম নাম ৬
মৈত্রেয়ী নাগ গল্প শোনা ১৪
অনিতা অগ্নিহোত্রী
তারাভরা আকাশের কাছে ৬৮
সুকান্ত সিংহ ইচ্ছে ডানা ৯২

কার্টুন ও কমিক্স

অমল চক্রবর্তী ছবির মজা ২১

চণ্ডী লাহিড়ি বেশি বাড় বেড়ো না ৯৬

বিভাগীয় রচনা

চিঠিপত্র ৭

অনিরুদ্ধ দেব মনের কথা কই ১৩

রাজশ্রী চক্রবর্তী চায়ের পাঁচালি ২২

হাত পাকাবার আসর ৩০

যশোধরা রায়চৌধুরী বই চেনো ৪০

পত্রবন্ধু হতে চাই ৪৯

অজয় হোম প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ৫৭

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কী দেখবে, কী শুনবে ৬১

রাজশ্রী রাহা রান্নাবান্না ৮৫

জয় মিত্র কেরিয়ার ক্যাম্প ৯৪

প্রতিযোগিতা

শারদীয় প্রতিযোগিতার ফলাফল ৮৩

প্রচ্ছদপট

সমীর সরকার

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ

ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্

সত্যজিৎ রায়

সমীর সরকার

চণ্ডী লাহিড়ি • অমল চক্রবর্তী

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দেবব্রত ঘোষ

নীতীশ মুখোপাধ্যায়

দেবাশিস দেব • সৌমিত্র সোম

সন্দীপ রায়

আলোকচিত্র

আশিসকুমার ঘোষ

শিল্প নির্দেশনা

সুজয় সোম

অঙ্গসাজ

নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত

শুভ্র রায় • মিঠু পাঁজা

কৌশিক ঘোষ

স ম্পা দ ক সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

সন্দেশ কার্যালয় ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড কলকাতা ৭০০০২০ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

ফোন • সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩। মার্কেটিং ৯৩৩৯৭৭২২৮৫। বিজ্ঞাপন ৯৮৩০৬৮৮০১৭

ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮ ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিনু মম নাম

অনেক জনে অনেক বাণী দেবে
অনেক তার দাম
তোমারে শুধু আশীষটুকু দিয়ে
লিখিনু মম নাম।

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

শোভন সোমের অটোগ্রাফ খাতা থেকে

নতুন 'সন্দেশ'-এ নতুন সত্যজিৎ রায়!

নতুন 'সন্দেশ' জমে গেছে। পেশাদারি 'সন্দেশ' পেয়ে গেছে বাণিজ্য-সফলতাও। একদিকে বিক্রি বাড়ছে হৈহৈ করে, পাঠকদের চিঠির পাহাড়, সম্পাদকীয় টেলিফোন সরগরম ভোরবেলা থেকে মাঝরাত্তির, অন্যদিকে বিজ্ঞাপনদাতা আর স্পনসরদের সঙ্গে ঘন ঘন মিটিং! সুনির্মল বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ থেকে অজয় হোম—প্রয়াত সেরা লেখকদের উত্তরাধিকারীরা আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন অজানা পাণ্ডুলিপি! এইসময়ের শ্রেষ্ঠ লেখকরা কখনও মুখোমুখি, কখনওবা টেলিফোনে কত-না দরকারি পরামর্শ, সেরা 'সন্দেশ' বানাবার সুলুক, এমনকী আমাদের দোষগুণও বলে দিচ্ছেন অকপটে—মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, শৈলেন ঘোষ থেকে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সরল দে, নবনীতা দেব সেন, অশোক দাশগুপ্ত। আজকের সময়ের সেরা লেখা না-পেলে যে কিছুতেই নতুন ভাবনার, নতুন মেজাজের, নতুন চেহারার 'সন্দেশ' পাকানো যাবে না—তাই নিয়ে কথা হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, মতি নন্দী থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার বা উজ্জ্বল চক্রবর্তীর সঙ্গে। লেআউট আর ইলাসট্রেশন নিয়ে শিল্পীদের সঙ্গেও অফুরন্ত সম্পাদকীয় বৈঠক—সমীর সরকার, চণ্ডী লাহিড়ি, সুধীর মৈত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায় থেকে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, দেবব্রত ঘোষ। ২০০৫-এর মে থেকে এই ১১ মাসে অ-আমন্ত্রিত বা ডাকে-আসা লেখার হিসেবটা শুনবে? ছড়া-কবিতা প্রায় আড়াই হাজার, নানারকম গদ্য হাজার ছাড়িয়ে!

এত সাফল্য আর প্রশংসার পরেও আমরা জানি আমাদের গলদটা—কোথায় সমস্যা, খামতি, সংকট, আতান্তর। এইসব বিচ্ছিরি ইয়েকে কীভাবে, কত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলা যায়, সবরকম চেষ্টা চলছে সারাক্ষণ। 'সন্দেশ' ১৪১৩-র বিজ্ঞাপনী পাতাটা খুললেই টের পাবে 'চাঁদের হাট' কাকে বলে! তার পরেও সব বয়সের ছোটদের সবরকম পরামর্শ বা সমালোচনার জন্য হা-পিত্যেশ করে আছি!

সবচাইতে রোমাঞ্চকর খবরটা কী বলো তো? নতুন 'সন্দেশ'-এ নতুন সত্যজিৎ রায়—এ-এক আশ্চর্য আহ্লাদ আমাদের! নতুন 'সন্দেশ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতেই কী ছোট্ট অথচ অবিস্মরণীয় গল্প—সত্যজিৎ রায়ের এমন লেখা আগে কখনও ছাপা হয়নি! এ-সংখ্যায় যে-উপন্যাসটা শুরু হচ্ছে—এপিক উপন্যাস—এমনভাবেও এর আগে প্রকাশিত হননি ওই ছ'-ফুট সাড়ে-চার ইঞ্চি লম্বা সৃষ্টিশীল মানুষটি!

ও-হ্যাঁ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম—অনিরুদ্ধ দেবের যে-গল্পটা এবারে ছাপা হল—'আকাশছোঁয়া গাছ'—এটাই লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প!

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

নতুন 'সন্দেশ' যুগ যুগ জিও!
সমীর সরকার জিন্দাবাদ!

এক বছর হতে চলল 'সন্দেশ' নতুন হয়েছে। ঠিক 'নতুন' নয়, 'সন্দেশ' এখন 'নিত্যনতুন'। নতুন চেহারা, নতুন ভাবনা, নতুন চোখ! পৃথিবীকে দেখতে শেখাচ্ছে নতুনভাবে। একটা সংখ্যা থেকে পরের সংখ্যাটা আরও ভালো, আরও নতুন। আমার ইশকুলের বন্ধুরা, পাড়ার বন্ধুরা অনেকেই—যারা অন্য ম্যাগাজিন রাখত—এখন 'সন্দেশ' রাখছে, 'সন্দেশ' না-পড়ে থাকতে পারছে না! গল্প-উপন্যাস আর ছড়া-কবিতা তো ফাটাফাটি, বিশেষ রচনা ও বিভাগীয় রচনাগুলোও দারুণ!

পৃথিবীর চিরকালের সেরা সংগীতস্রষ্টা মোৎসার্টকে নিয়ে কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটা—'দুষ্টু পরীর গল্প'—পশ্চিমের মার্গসংগীত নিয়ে এত ভালো লেখা কোনওদিন পড়িনি! অতনু চক্রবর্তীর 'ডোভার লেনে যাচ্ছ তো?' পড়ে আমার তো সত্যি সত্যি ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স-এ যেতে ইচ্ছে করছিল। এবারে কার্ড জোগাড় করা গেল না। বাবা বলেছেন, পরের বারে নিয়ে যাবেন। ফেলুদার গল্পে আমার সবচাইতে প্রিয় চরিত্র লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ু। সুনীত সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে জটায়ুর জীবনী লিখছেন, সেটা পড়ে-যে কী ভালো লাগছে, কী বলব! শোভন সোমের 'পাড়া-জুড়ে শিল্পের উৎসব' পড়ে গোয়ার পানাজি শহরের মানুষদের ওপর শ্রদ্ধা হল খুব, তেমনি ভারী রাগ হল কলকাতার মানুষদের ওপর। কলকাতাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে আমরা যতই গর্ববোধ করি-না কেন, এই কলকাতার বেশিরভাগ মানুষের সংস্কৃতিবোধ নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে!

'বাদশাহী আংটি' বইটা নিয়ে এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমা নিয়ে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর লেখা-দুটো পড়ে আমি এবং আমার বন্ধুরা কেউ কেউ এতটাই উত্তেজিত, পৃথিবীকে দেখার চোখটাই বোধহয় আমাদের পাল্টে যাচ্ছে! সুজয় সোমের 'ফালতু খাতা' পড়ে আমাদের বেঁচে-থাকা ও জীবনযাপনকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম, আর সত্যজিৎ রায় ও লীলা মজুমদারকে গভীরভাবে অনেকখানি চিনতে পারলাম। মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-ক্লাসের রাশিয়ান দিদিমণি ও রাশিয়ান ছাত্রছাত্রীদের লেখাগুলো পড়ে আমার তো ইচ্ছে করছিল মস্কোতে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ভাব করি! জানুয়ারি মাসে ওঁরা সবাই কলকাতায় এলেন, 'সন্দেশ'-এর অফিসে গেলেন, হয়তো বইমেলাতেও গেছিলেন—ওঁদের সঙ্গে সামনাসামনি দেখাও হল না! ওঁদের খালি একদিন দেখলাম, ওঁদের কথা শুনলাম 'তারা নিউজ' চ্যানেলের একটা অনুষ্ঠানে, সলিল চৌধুরীর 'ধিতাং, ধিতাং বলে...' গানটাও গাইলেন সবাই মিলে! 'বসন্ত সংখ্যা'য় লীলা মজুমদারকে নিয়ে যে সম্পাদকীয়টা ছাপা হয়েছে, এরকম ভালো আর মন-কেমন-করা সম্পাদকীয় কোনও ছোটদের ম্যাগাজিনে কখনও পড়িনি!

রবিবার, ১২ মার্চের 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় একটা আস্ত পাতা-জুড়ে নতুন 'সন্দেশ'-এর কথা, এমনকী সেকালের 'সন্দেশ'-এর কথা—কতকিছু জানতে পারলাম। এখনকার 'সন্দেশ'-এর প্রিয় বড়সম্পাদকমশাই সন্দীপ রায়ের ইন্টারভিউটা পড়ে বুঝতে পারলাম—কত কষ্ট করে আপনারা আমাদের জন্য এমন 'সেরা' ম্যাগাজিন বের করে যাচ্ছেন মাসে মাসে। সবচেয়ে আনন্দ হল এই কথা জেনে—এপ্রিলের 'সন্দেশ' থেকেই শুরু হচ্ছে আমার সবচাইতে প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়ের অজানা উপন্যাস 'অবতার'—যে-গল্পটা নিয়ে সিনেমা হবার কথা ছিল হলিউড-এর ব্যানারে!

তবে নতুন 'সন্দেশ'-এর সবচাইতে আর্কষণের দিক হল লেআউট এবং ইলাসট্রেশন! এমন-আর এখনকার—কী বড়দের, কী ছোটদের—কোনও ম্যাগাজিনেই দেখা যায় না। নতুন 'সন্দেশ'-এর এইসব ছবি দেখে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি, স্বপ্ন দেখে ফেলছি, আর ছবি-আঁকা প্র্যাকটিস করছি! সমীর সরকারের আঁকা ছবির তো কোনও তুলনাই হয় না—যত দেখি, তত মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। মা বলেছেন, সমীর সরকারের মতো এত বড় শিল্পী, এত ভালো ডিজাইনার আমাদের দেশে এখন-আর একজনও নেই! তিনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও বিজ্ঞাপনের অফিসে চাকরি করে অনেক কিছু শিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা আর শঙ্কুর বইতে সমীর সরকারের আঁকা ছবি ও মলাট দেখে আমাদের মন ভরে যায়! দেবব্রত ঘোষ আর যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ইলাসট্রেশনও দারুণ লাগছে। খুব খুশি হয়েছি নারায়ণ দেবনাথ, সুধীর মৈত্র, দেবাশিস দেব, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি পাচ্ছি বলে। ছোটবেলা থেকেই নারায়ণ দেবনাথের

কমিক্‌স দেখেছি, এই প্রথম তাঁর ইলাসট্রেশন দেখলাম নতুন 'সন্দেশ'-এর দৌলতে। বাবা বলছিল, এতই যখন চিত্রশিল্পীদের মহাসমাবেশ ঘটাচ্ছেন আপনারা—রণেনআয়ন দত্ত, বিজন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং যোগেন চৌধুরীকে দিয়ে আঁকানো যায় না? চণ্ডী লাহিড়ি, অমল চক্রবর্তী আর অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কার্টুন ও কমিক্‌স দুর্দান্ত। একটা কথা, বাবা লিখতে বলল—ভারতের চিরকালের সেরা একজন কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণকে আবার আমাদের সামনে হাজির করছে না কেন নতুন 'সন্দেশ'?

সব মিলিয়ে এখন বলতেই হয়—নতুন 'সন্দেশ' যুগ যুগ জিও! সমীর সরকার জিন্দাবাদ!

দীপ্রভ রায়
বি ১৫/৭ উত্তরায়ণ আবাসন
১০২ বি টি রোড। কলকাতা ৭০০১০৮
নবম শ্রেণী। ডন বস্‌কো, লিলুয়া

বুদ্ধদেব গুহর ধারাবাহিক উপন্যাস 'ফোটা কার্তুজের গন্ধ' নিয়ে শারদীয় 'সন্দেশ'-এ শান্তনু ঘোষের একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। উপন্যাসটিতে কিছু তথ্যগত ভুল দেখিয়েছেন তিনি । তাঁর চিঠির উত্তরে বুদ্ধদেব গুহর চিঠিটা আমার ভালো লাগেনি।

প্রথমেই মাফ চেয়ে নিই, ঋজুদার কোনও গল্প আমার পড়া হয়নি। এটুকু ধারণা আছে—ঋজুদা এবং তাঁর সঙ্গীরা কাল্পনিক চরিত্র, তাঁদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো কাল্পনিক, পটভূমিটা বাস্তব। লেখকের অন্য-কিছু লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত। 'মাধুকরী', 'কোজাগর' বা 'চাপরাশ'-এর মতো উপন্যাস আমার ভালো লেগেছে। তাঁর চিঠির কিছু কথার সঙ্গে মতের অমিলের জন্যেই এ-চিঠি লিখছি, লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রসূত নয়।

'শান্তনুবাবু যদি তাঁর চিঠিতে শুধু 'ফোটা কার্তুজের গন্ধ' সম্বন্ধে ভালো না-লাগার কথাই বলতেন, তাহলে এই উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁর চিঠি পড়ে মনে হয়েছে—তিনি তত্ত্ব এবং সাহিত্যের মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ, এই সরল সত্যটি সম্পর্কে সম্পূর্ণই অনবহিত।' (বুদ্ধদেব গুহ)

শান্তনুবাবুর চিঠিতে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অবহিত অথবা অনবহিতর কথা জানা যায় না। তিনি শুধু একটা বিশেষ লেখায় কিছু তথ্যের ভুলের কথা লিখেছেন। বুদ্ধদেববাবুর এই উক্তিতে অবজ্ঞার প্রকাশ পেয়েছে।

যতদূর জানি, সাহিত্যের বেশ-কিছু ধারা আছে। আমি যদি মহাশ্বেতা দেবীর 'ন্যাদোশের জন্মদিন' গল্পটা পড়ে তাঁকে খুব

বকাবকি করি যে, ৫০ বছর আগে মরা গরু আপনার বাড়িতে চা খেতে এসেছে—এরকম আজগুবি কথার ভিত্তি কী? অথবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুতুড়ে' সিরিজের গল্পগুলোতে চোর ও ভূতের উপস্থিতি নিয়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ করি, সেটা হাস্যকর হবে নিঃসন্দেহে।

ঋজুদা'র গল্পগুলো এই ধারার নয়। পটভূমির বাস্তবতার ভিত্তিতে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার গল্পের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। ফেলুদার গল্প-উপন্যাস আমার খুবই প্রিয়। অনেক পড়েছি, বার বার পড়ি। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা, এমনকী রাজনীতি সম্পর্কেও আমার জানার আগ্রহ হয়েছে ফেলুদা পড়েই। ছোটবেলায় আমার হিরো ছিলেন ফেলু মিত্তির। ফেলুদা কিছু ভুল বলবেন, ভুল করবেন, এরকম ভাবাই যেত না। তখন গল্পকারকে দেখিনি, গল্পটাই দেখেছি। চরিত্রদের অনুভব করেছি, ভালোবেসেছি, তাঁদের সাফল্যে আনন্দিত হয়েছি।

ঋজুদাও নিশ্চয়ই অনেক কিশোর-কিশোরীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কথা, তাঁর কাজ অবশ্যই ছাপ ফেলে পাঠকের মনে। বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন : 'আমার ঋজুদাকাহিনিগুলিতে এবং অন্যান্য অরণ্যভিত্তিক উপন্যাসের মাধ্যমে তিন প্রজন্মের বাঙালিকে অরণ্য এবং অরণ্য-প্রাণীকে ভালোবাসতে শিখিয়েছি। এইটুকুই আমার পুরস্কার।'

ভালো কথা। এ-কারণেই তাঁর অন্য একটা উক্তিতে আমার আপত্তি আছে। নীচে শান্তনু ঘোষ ও বুদ্ধদেব গুহর চিঠির অংশ তুলে দিচ্ছি—

'ভটকাই বলল, '...ওই ভূতগাছগুলোর বটানিক্যাল নাম হচ্ছে কারু-গাম-ট্রি।' অবগতির জন্য জানাই, এটি আদ্যন্ত একটি ইংরিজি নাম। বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয় কিছু নির্দিষ্ট রীতি-নীতি মেনে। যেমন ধরা যাক শালগাছের বৈজ্ঞানিক নাম 'শোরিয়া রোবাস্টা'—এখানে 'শোরিয়া' হল গণ, 'রোবাস্টা' তার একটি প্রজাতি।' (শান্তনু ঘোষ)

'আপনি কি আন্ধারী-তাড়োবাতে কখনও গেছেন? না-গিয়ে থাকলে, যান একবার। গ্রীষ্মে ভূতগাছের শোভা দেখে আসুন। তার ইংরিজি নাম আর বটানিক্যাল নামের তফাৎ নিয়ে কচকচি তখন আর করবেন না। আন্ধারী-তাড়োবার বনবিভাগের ব্রোসিওরেও সম্ভবত বটানিক্যাল নামটি নেই। বটানিক্যাল নাম না-জানলেও, সাধারণ পাঠকের কী এসে যায়? আমি তো উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণীবিজ্ঞানের শিক্ষক নই। পাঠকরাও আমার ছাত্র নয়।' (বুদ্ধদেব গুহ : শান্তনু ঘোষের উত্তরে)

প্রথমত, ইংরিজি আর বটানিক্যাল নামের কচকচি শান্তনু শুরু করেননি। ভটকাই বটানিক্যাল নাম বলতে চেয়ে ইংরিজি নাম বলেছে। শান্তনু ভুলটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন মাত্র। তাঁর উত্তরে বুদ্ধদেববাবুর কথাগুলো অযৌক্তিক, আক্রমণাত্মক এবং আধিপত্যসুলভ। ভূতগাছের শোভার তুলনায় বটানিক্যাল আর ইংরিজি নামের ফারাক অকিঞ্চিতকর হতে পারে। সাধারণ পাঠকের এই নাম না-জানলেও কিছু ক্ষতি না-হতে পারে। (ঋজুদাকাহিনি না-পড়লেই বা কী যায় আসে?) বুদ্ধদেব গুহ পাঠককে যা দিচ্ছেন, সেই তুলনায় এই ভুল নিতান্তই তুচ্ছ হতে পারে। তার পরেও ভুলটা তো ভুলই। বটানিক্যাল নামটা না-জানা থাকলে, ভটকাইকে দিয়ে ইংরিজি নামকে বটানিক্যাল নাম বলে চালানো নিশ্চয়ই দোষের। ভটকাই অনভিজ্ঞ হতে পারে, লেখক তো তা নন। বরং 'নাম না-জানা পাখি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল' বলাই ভালো, ভুল নাম বলার চাইতে। ভটকাই যদি আদৌ ওই বাক্য না-বলত, তবে বলার কিছু ছিল না। তখন শান্তনুবাবু নিশ্চয়ই ভুল শুধরে দিতেও আসতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তথ্যটুকু বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন, এবং ভুল বলেছেন। তুচ্ছ যদিও তুচ্ছ, তার পরেও তার অস্তিত্ব আছে। ভুল স্বীকার করে নেওয়াটাই সততার ব্যাপার হত।

'রুদ্র আর ভটকাই-এর কথোপকথন দুই ছেলেমানুষের ব্যাপার। তাদের সেই কথোপকথন—যদি তা ভুলও হয়—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।' (বুদ্ধদেব গুহ)

এটা কি সত্যি খুব যুক্তিগ্রাহ্য আত্মপক্ষ সমর্থন হল? গল্পের চরিত্রের জ্ঞান বা অজ্ঞতা তার লেখকের জ্ঞান বা অজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ। লেখক যা জানেন না, তা কী করে লিখবেন? ভটকাই ভুল তথ্য দিত না, যদি লেখার সময় বুদ্ধদেববাবু সঠিক নামটা জানতেন, এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন তিনি?

এ-প্রসঙ্গে ফেলুদাকে মনে পড়ছে আবার। নানা গল্প-উপন্যাসে এ-রকম অনেক দৃশ্য আছে, যেখানে লালমোহনবাবুর কোনও তথ্যগত ভুল ধরে দিয়ে ফেলুদা তাঁকে বকা দিচ্ছেন বা রসিকতা করছেন। এ-সমস্ত দৃশ্যে গল্পের সাহিত্যমূল্য একদম বিঘ্নিত না-করেও, সঠিক তথ্যটা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

আমি মনে করি বাস্তব প্রেক্ষাপটভিত্তিক গল্প লেখার সময়ে সঠিক তথ্যটা দেওয়া হল কিনা, সে-বিষয়ে সতর্ক থাকা একজন লেখকের প্রাথমিক কর্তব্য। যে-লেখক কৃতিত্ব দাবি করেন 'বাঙালি-পাঠককে কিছু কিছু পাখি, ফুল, প্রজাপতি' চেনানোর, পাঠককে ভুল তথ্য দেওয়ার দোষটুকু তিনি স্বীকার করবেন—এটা খুব ন্যায্য চাওয়া একজন পাঠকের।

শুধুমাত্র 'বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সাহিত্যিক হওয়া যায় না' সত্যি, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বা অবহেলার কারণে ভুল তথ্য দিয়ে কোনওকিছুই তেমন হওয়া যায় না। একটু-আধটু ভুল থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না ধরনের মানসিকতা খুব ক্ষতিকর। কল্পনা ও মিথ্যাচার এক ব্যাপার নয়।

তথ্য ও সাহিত্যে ফারাক থাকলেও, বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। বরং ঋজুদাকাহিনির বাস্তব পটভূমির কারণে সঠিক তথ্য আবশ্যক। একে ভেবে নেওয়া যায় গল্পের কঙ্কাল হিসেবে, এরপর ভাষার ব্যবহার, কল্পনা, ঘটনা পরম্পরা, দৃশ্যের বর্ণনা যাকে সম্পূর্ণ করে তোলে।

লুনা রুশদী
প্রযত্নে, পার্সোনাল ক্রেডিট সেন্টার
ব্যাঙ্ক অব নিউজিল্যান্ড
লেভেল ১, ৮০ কুইন স্ট্রিট
অকল্যান্ড সেন্ট্রাল
নিউজিল্যান্ড

আজ থেকে বহুদিন আগে, আমাদের ইশকুল জীবনে, বন্ধুর বাড়ি গেছি পড়াশোনা করতে। পড়া চলছে, এমন সময়ে আমাদের একটা অভিধানের প্রয়োজন হল। কিন্তু অভিধানটা রয়েছে আমার বন্ধুর দাদার পড়ার টেবিলে। দাদা আমাদের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়—সেই বয়সে ব্যবধানটা সাংঘাতিক বেশি, সন্দেহ নেই। দাদা বাড়ি নেই, তাই তার অনুমতির প্রশ্ন আসে না। যেহেতু আমি যেখানে বসে, সেখান থেকে হাত বাড়িয়েই অভিধানটা নিতে পারি, তাই বন্ধুর নির্দেশে সে-কাজটা আমাকেই করতে হল।

খানিক বাদেই ফিরে এলো দাদা। এসে টেবিলে বসেই জিজ্ঞেস করল, 'আমার ডিকশনারি কে নিয়েছে?'

আমি নিয়েছি, কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরল না। বন্ধু বলল, 'আমরা।'

'কী আশ্চর্য! কথা নেই বার্তা নেই, ডিকশনারি নিয়ে নিয়েছ? কার সাহসে?'

'কোন সাহসে' কথাটা বাবা-মায়ের বকুনির কল্যাণে জানা ছিল, কিন্তু 'কার সাহসে'? এ আবার কী কথা?

আমার বন্ধু শুনলাম অম্লানবদনে বলল, 'খানিকটা তোমার, খানিকটা আমার।'

এতক্ষণে বুঝেছি, বন্ধুর বদমেজাজি দাদা আপাতত ভালো মুডে আছে। তাই আমিও নিঃশব্দে মজা পেতে শুরু করেছি।

বন্ধুর দাদা কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'অডাসিটির বলিহারি! আমাকে না-জিজ্ঞেস করেই তুমি আমার সাহস খরচা করে বসে আছ?'

আজ এই চিঠিতে আমার কৈশোরস্মৃতির অবতারণার কারণ, এই চিঠির সঙ্গে 'আকাশছোঁয়া গাছ' নামে যে-গল্পটা, সেটা

আমি পাঠাতে পারতাম না, যদি-না 'সন্দেশী'-বন্ধু উজ্জ্বল চক্রবর্তী সাহস দিতেন। সুতরাং, এই গল্প পাঠাবার পেছনে খানিকটা আমার সাহস, আর খানিকটা উজ্জ্বলের সাহস! অবশ্য আমি বোধহয় উজ্জ্বলের সাহস খরচা করে বসে নেই, সামান্য ধার নিয়েছি মাত্র।

গল্পটা যদি ছাপা হয়, সেটাই হবে ছোটদের জন্য আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প!

অনিরুদ্ধ দেব
জি ১০, দিগন্তিকা। ব্লক এ এইচ
সল্ট লেক। কলকাতা ৭০০০৯১

নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রচার ও প্রসার যে অনেকটাই বেড়েছে, শুধুমাত্র 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত চিঠিগুলো পড়লেই বেশ বোঝা যায়। 'সন্দেশ'-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি তো ঘটছেই...রূপে, রসে, বর্ণে এবং রচনাবৈচিত্র্যে টইটম্বুর হয়ে উঠছে এই পত্রিকা। রসগ্রাহী যে-কোনও বয়সের মানুষ এ-কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য।

এই পরিস্থিতিতে, একটা আবেদন 'সন্দেশ'-প্রেমী সব মানুষকে —যাঁরা আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন 'সন্দেশ'কে, যাঁরা কামনা করেন 'সন্দেশ'-এর চারপুরুষ-অর্জিত অপরূপ কৃষ্টি দুনিয়াজোড়া মানুষের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক, 'সন্দেশ'-এর বিশুদ্ধসুন্দর মঙ্গলালোকে সব শিশু-কিশোর উন্নতশ্রেণীর খাঁটি মানুষ হয়ে উঠুক, জগৎসভায় 'সন্দেশ' শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক।

(১) আমরা যারা 'সন্দেশ'কে ভালোবাসি,প্রত্যেকেরই উচিত 'সন্দেশ'-এর প্রচার যাতে ভীষণভাবে বেড়ে যায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এটা সম্ভব, যদি আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, খেলার সাথি অথবা অল্পপরিচিত মানুষের চোখের সামনে নতুন 'সন্দেশ' মেলে ধরি। এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে— তাঁদের অধিকাংশই আকৃষ্ট হবেন। তাঁরা হয়তো এই পত্রিকার গ্রাহক হবেন, অথবা স্টলে গিয়ে পত্রিকাটা কিনতে চাইবেন। এভাবে 'সন্দেশ'-এর বিক্রি যদি যথেষ্ট বাড়ানো না-যায়, তবে বড় বড় কোম্পানির আরও বিজ্ঞাপন 'সন্দেশ' পাবে না। আর, যথেষ্ট বিজ্ঞাপন না-পেলে, বর্তমান চেহারায় ও সৌন্দর্যে 'সন্দেশ' আর প্রকাশিত হতে পারবে না। রক্তাপ্লতায় ভুগে ক্রমশ রুগ্ন হয়ে পড়বে। পত্রিকা-পরিচালনা সম্পর্কে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা, তা থেকে জোর দিয়ে এ-কথা বলতে পারি—সর্বাঙ্গসুন্দর অপরূপ এই পত্রিকা কখনও ১০ টাকা দামে বিক্রি করা যায় না। যাঁরা বলেন যায়, তাঁরা হয় প্রকৃত খবর রাখেন না, অথবা সঠিক কথা বলছেন না।

(২) আমাদের অনেকেরই আত্মীয়-বন্ধুরা বিদেশে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাংলাভাষা ভালোবাসেন, আমরা তাঁদের কাছে নতুন 'সন্দেশ'-এর যে-কোনও একটা সংখ্যা যদি উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিই, তাঁরা হয়তো প্রভাবিত হতে পারেন। গ্রাহক হতে পারেন। এন আর আই-দের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট ধনী। তাঁদের মধ্যে থেকে হয়তো আমরা স্পনসরও পেয়ে যেতে পারি। 'স্পনসর' হচ্ছে একজাতের পৃষ্ঠপোষক—যাঁরা প্রচারের বিনিময়ে অর্থসাহায্য করেন, অথবা শর্তসাপেক্ষে কোনও প্রতিষ্ঠানের আংশিক ব্যয়ভার বহন করেন। আমরা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমেও এই কাজটা করতে পারি।

(৩) স্পনসর-এর ব্যাপারটা আমরা নিজেদের দেশেও চেষ্টা করতে পারি। খুঁজতে হবে ধনী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান। দেখতে হবে, সেই ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের শিল্প-সংস্কৃতির দিকে ঝোঁক এবং শ্রদ্ধা আছে কিনা, বিশেষত শিশুসাহিত্যের দিকে কিংবা সত্যজিৎ রায় ও তাঁর পরিবারের শিল্প-সংস্কৃতির অবদানের দিকে। তার পরের কঠিন কাজ হল—সেই সম্ভাব্য স্পনসরকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করানো। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবী-জুড়ে খেলাধুলো থেকে শিল্প-সংস্কৃতি থেকে বিনোদন জগতের বহু কর্মকাণ্ড চলে স্পনসরদের সাহায্যে। একটু খোঁজ নিলেই ব্যাপারটা বিশদে জানা যায়।

(৪) মনে রাখতে হবে আমরা 'সন্দেশ'কে ভালোবাসি। বলা চলে—আমরা 'সন্দেশ'-পরিবারের লোক। আমাদের উচিত, যে যেভাবে পারি, আপ্রাণ চেষ্টায় 'সন্দেশ'কে সাহায্য করা। একটুখানি মাথা ঘামালে, সুন্দর সুন্দর উপায় বেরিয়ে আসে। তাতে আমাদেরও লাভ অনেক। একটা সুপরিকল্পিত, অপরূপ দক্ষতায়, এমন বর্ণময়, সুস্থ-সুন্দর পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হবে—যা আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনাবিল আনন্দের মধ্যে মানুষের মতো মানুষ গড়ে উঠতে দীর্ঘস্থায়ী, অবিচল সাহায্য করে যেতে পারবে!

(৫) মনে রাখতে হবে 'সন্দেশ'-এর পরিচালকরাও আমাদের খুব ভালোবাসেন। নইলে রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে 'সন্দেশ'কে সুন্দর, এত মনোলোভা,আমাদের জীবনে এমন অপরিহার্য করে তুলবেন কেন? 'সন্দেশ'-এর প্রতি ওঁরা একনিষ্ঠ এবং নিবেদিত প্রাণ। সে তো আমাদের আনন্দসাগরে ভাসাবার উদ্দেশ্যেই।

গোপাল আচার্য
৭০ আনন্দ আবাসন
গড়িয়া স্টেশন রোড। কলকাতা ৭০০০৮৪

❑ 'সন্দেশ'-পরিবারে আপনার মতো একজন আত্মীয়কে পেয়ে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। আপনাকে প্রণাম। স স।

অনিরুদ্ধ দেব

মনের কথা কেই

টিভি দেখা কি উচিত নয়? এই প্রশ্নটা ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই আমাকে করে। কেউ বলে, 'আমাদের বাড়িতে কেবল্ নেই, আমার পড়াশোনার জন্যে মা-বাবা কেটে দিয়েছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার বন্ধুরা তো টিভি দেখে, তারা তো পড়াশোনা করে না এমন নয়।' আবার কেউ বলে, 'আমি খুব টিভি দেখি বলে ছোটকা আমাকে 'হাঁদারাম' বলে ডাকে! আচ্ছা, বেশি টিভি দেখলে কি লোকে হাঁদা হয়ে যায়?'

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষেও সহজ নয়। এটুকু বলতে পারি—টিভি দেখা সবসময় খারাপ না। টিভিতে এমন-কিছু যখন দেখায়, যেটা ছোটদের উপযোগী নয়, তখন টিভি দেখা খারাপ হতেও পারে। বড় বেশি বোকা-বোকা জিনিস হরদম দেখলে, হাঁদা হয়ে যাবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন, বইপড়া ভালো, কিন্তু 'বড়দের বই' পড়া সবসময় ভালো না-ও হতে পারে। লীলা মজুমদার অবিশ্যি বলেছেন, 'যে-বই পড়ে ছোটরা মানে বুঝতে পারে, কিম্বা যে-বই ছোটদের ভালো লেগে যায়, সেটাই ছোটদের বই।'

মুশকিল হল, কোন জিনিসটা ছোটদের উচিত এবং কোনটা নয়, সেই সম্বন্ধে কোনও সুষ্ঠু নিয়ম বড়রা এখনও ভেবে বের করতে পারেনি। সব বড়দের মতে টিভি নিশ্চয়ই সবসময় ছোটদের জন্য খারাপ নয়। কারণ, ছোটদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম, এমনকী ছোটদের জন্য সম্পূর্ণ চ্যানেল—সে তো ছোটরা চালায় না, বড়রাই চালায়। আর যারা প্রোগ্রাম বানায়, টিভি-চ্যানেল চালায়—সব বড়রাই হাঁদা নয়, কারও কারও বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে!

কাজেই, আমি যদি 'শক্তিমান' দেখি, তাহলে সেটা অন্যায় নয়। 'শক্তিমান' তো আমার দেখার জন্যই তৈরি হয়েছে, আমার মা বা রাঙাপিসি বা শিবুদার দেখার জন্য নয়! সেইসঙ্গে 'বে-ব্লেড' এবং অন্যান্য 'টুনামি'—তা-ও আমার জন্য। তারপর 'মিস্টার বীনস্'। তার আগে 'জাস্ট ফর লাফস্—গ্যাগস্'। তাছাড়া... দাঁড়াও, থার্ড টেস্টের সেকেন্ড দিনে ইন্ডিয়া কত করল, দেখে নিই। ওরে বাবা, রাহুল ৮৫! এক্ষুনি সেঞ্চুরি হয়ে যাবে। না, রাহুল আবার এত আস্তে রান করে, ১৫ রান করতে দেড় ঘণ্টা! এক্ষুনি আবার সোনি-তে সিনেমা শুরু হবে। মা, তোমায় কিন্তু আগেই বলে রেখেছি, ওটা আমি দেখতে চাই।

মোট কথা, মাত্রা না-রাখতে পারলে, সব বিষয়ই বিষ হয়ে যায়। নানারকম বইপড়া ভালো, কিন্তু সারাক্ষণ যদি বই-ই পড়ে যাই, বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে! পত্র-পত্রিকা ও বইপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলো, যোগব্যায়াম, সিনেমা-থিয়েটার দেখা, গান-বাজনা শোনা, টিভি দেখা, বেড়ানো, আড্ডা মারা—সবই দরকার ছোটবেলা থেকে। ভালোভাবে বেঁচে-থাকার জন্য।

তাহলে টিভি কী দোষ করল? টিভিতে একশোটা চ্যানেলের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই আমাদের ভাবতে শেখায় না! বেশিরভাগই বোকার মতো হাঁ করে দেখা এবং হাঁ করে শোনা! যদি ভাবার মতো, বোঝার মতো কোনও অনুষ্ঠান দেখি, যেই পরের চ্যানেলে চলে গেলাম রিমোটের বোতাম টিপে—কারও দুমদড়াক্কা নাচ-গান বা 'টাকেশি'স কাসল'-এর লাফ-ঝাঁপ অথবা 'পাওয়ার জোন'-এর হাত থেকে আগুন বেরনোর খেলায় মেতে—ভুলে গেলাম কী সেরা জিনিসটাই-না দেখেছি একটু আগে!

টিভি থেকে উপকার পেতে হলে, টিভিকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে। সেই ব্যবহার থেকেই আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি হবে। শুধু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেই শেখার বিষয় থাকে, এমন নয়। সবরকম অনুষ্ঠান থেকেই শেখা যায়, আনন্দ পাওয়া যায়। কার্টুন, গান, সিনেমা, টক-শো, খবর, খেলার রিলে—সব থেকেই। কিন্তু আমি কতটা শিখব, আর কতটা অপচয় হবে, তা নির্ভর করবে আমার ওপর। শুধুই আমার ওপর।

কোনও জিনিসই খারাপ বা ভালো নয়। উপকারিতা শুধুমাত্র সংযমে। না-হলে সবই যম! বুঝেছ হাঁদারাম?

নামাঙ্কন : দেবাশিস দেব

অলঙ্করণ : অমল চক্রবর্তী

গল্প শোনা

মৈত্রেয়ী নাগ

‘পেট ভরা তাই ভাত খাবি না?
আয় এখানে বোস তো—
আজকে শুধু ডাল ভাত আর
সঙ্গে আলু পোস্ত।’

‘অনেকটা তো দুধ খেয়েছি
একটু খাব, অল্প।’

‘শোনাই যদি আস্ত একটা
পছন্দসই গল্প?’

‘কোনটা বলবে? সেই-যে কোন্ এক
রাজা, নাকি রানিমা
লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল?
ও-গল্প তো জানি মা!

‘ওইটা না রে, বনের মধ্যে
থাকত একটা গণ্ডার—’

‘ওই-তো যেটার লোভ ছিল খুব
লুচি, মিঠাই, মণ্ডার।’

'ওঃ! সেটা না, এ-গণ্ডারের
বিশাল ছিল খড়্গ।'

'মনে আছে, যার দু'-ভাই ছিল
বিন্দু আর বিসর্গ।'

'বেশ, ওটা থাক। এক যে ছিল
প্যাঁচা, আর এক প্যাঁচানি।'

'জানি, জানি—প্যাঁচানিটার
বিশ্রী ছিল চ্যাঁচানি।'

'আচ্ছা, তবে বলব নাকি
রামায়ণের কাহিনি?'

'না, ওটা না। বড্ড বোকা
রামের বানরবাহিনী।'

'তোর বুঝি খুব বুদ্ধি বেশি?
এই তো কেমন ঝট করে
খেয়েও নিলি, গল্প শোনাও
হচ্ছে না আর চট করে।'

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ধা রা বা হি ক আশ্চর্য উ প ন্যা স !

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : সমীর সরকার

শৈলেন ঘোষ

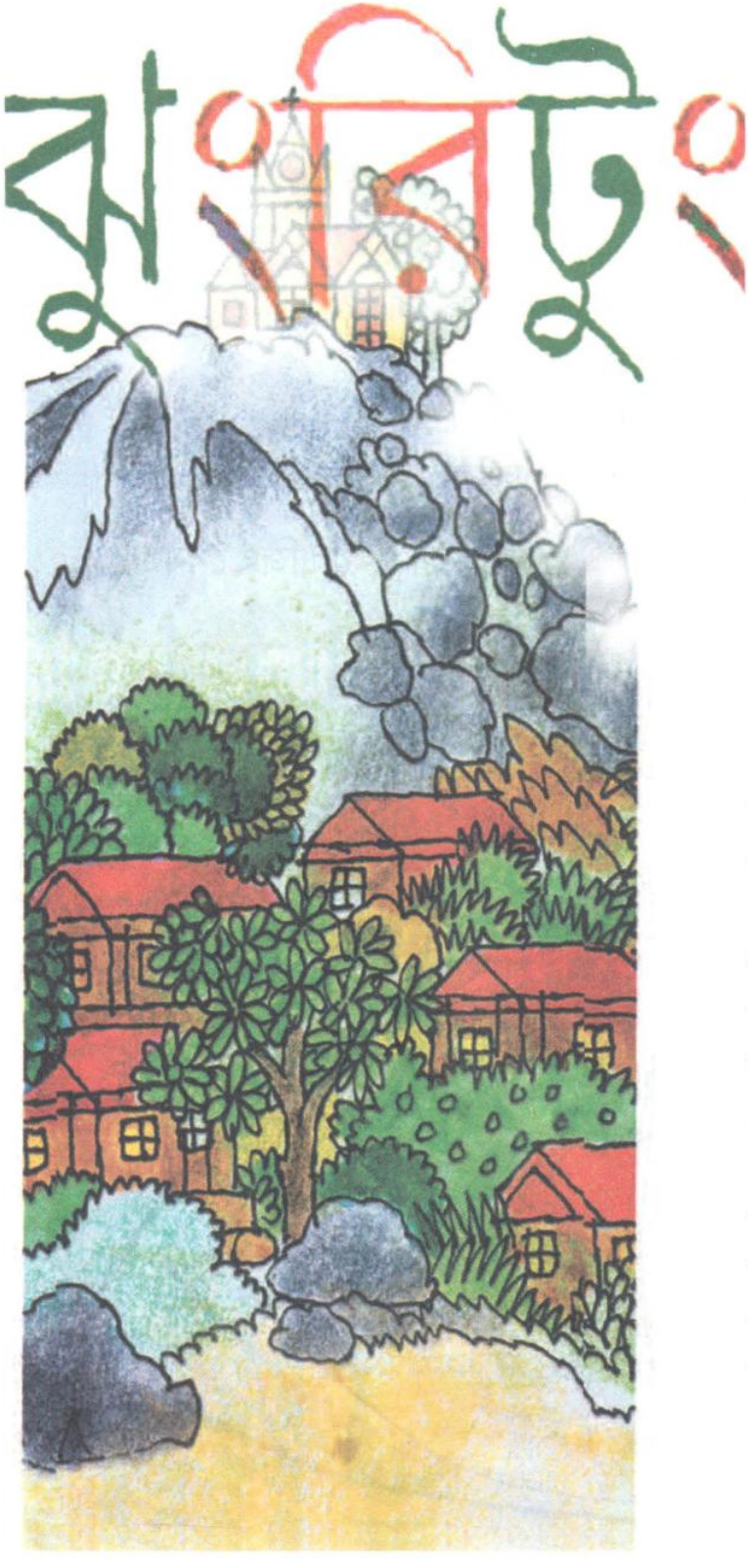

চু ম্ব ক

সমুদ্র আর পাহাড়-ঘেরা দ্বীপ ঝুংরিটুং-এ থাকত দুই ভাই-বোন, টুসু আর মানটি। মাছ ধরতে গিয়ে দাদু ও বাবার নৌকো ডুবে গেল। দাদুকে বাঁচালেন বিদেশি জাহাজের নাবিক। সমুদ্রতটে রাত্তিরে জ্ঞান ফিরতে বাবা দেখলেন—কেউ কোত্থাও নেই, পথ-আগলে পাহাড়! খানিক বাদে পাহাড়ে উঠতে-থাকা একটি ছেলেকে অনুসরণ করলেন, ছেলেটা হঠাৎই অদৃশ্য! একটু পরে পাহাড়ের নীচে জ্বলন্ত শেজবাতি, বোরখাপরা মানুষের হাতে। বোরখামানুষের পিছু নিয়ে একটা গুহায় ঢুকে বোঝা গেল—চার-পাঁচজন দুর্বৃত্ত একজন উপোসি-মানুষকে খাওয়াবার জন্য হম্বিতম্বি করে, হাল ছেড়ে গজরাতে লাগল। দুর্বৃত্তরা ঘুমিয়ে পড়লে বাবা বন্দি-মানুষকে বুঝিয়ে, দু'জনে খেলেন। অন্ধকারে দুর্বৃত্তদের ঘায়েল করে যাকে নিয়ে বাবা গুহা থেকে পালালেন, তাকে ওরা ধরেছিল একটা ছেলের বাবা ভেবে—যে-ছেলেটা গোপন ধনরত্নের সন্ধান জানে! হাঁটতে হাঁটতে সন্দেহজনক বুড়োকে অনুসরণ, মানুষটা: হঠাৎই অদৃশ্য! একটু এগোতেই আবার দেখা গেল বুড়োকে: ওঁর নাতিহারিয়েছে এই বনে, সে দস্যুদের লুঠ করতে দেখে ফেলেছিল। হঠাৎ অন্ধকার চিরে হট্টগোল, হঠাৎই সব নিস্তব্ধ! বুড়োমানুষটা আবার অদৃশ্য! তাঁর ফেলে-যাওয়া পুঁটলি থেকে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে বাবা দেখলেন—সামনে সেই হারিয়ে-যাওয়া ছেলেটা, কুশল। এদিকে বাবার সঙ্গী অদৃশ্য! কুশল জানাল, সঙ্গীটি আসলে দুর্বৃত্ত! লুকোবার চেষ্টায় কুশলের সঙ্গে পাহাড়ে চড়াই-উতরাই ছুটতে ছুটতে বাবার হঠাৎই মনে হল—কুশল দুর্বৃত্তদলের গুপ্তচর নয়তো?

আট

ছেলেটা বেশিক্ষণ আর বোবা হয়ে থাকতে পারল না। বাবা আবার ধমকে উঠলেন, 'চ' থানায়।'

এবার ছেলেটা আকুল হয়ে বলে উঠল, 'আপনি ভুল করছেন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে একটা কথাও মিথ্যে বলিনি। দুর্বৃত্তরা আমাকে ধরবে বলে পাহাড়ের চারদিক ঘিরে রেখেছে। বিশ্বাস করুন, ওরাই আমার দাদুকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি দেখেছি।'

বাবা ধমকের সুরেই বললেন, 'আমি দেখতে পেলুম না, তুই কেমন করে দেখলি?'

'আমি সব দেখতে পাই। সব জানতে পারি। আমি জানি, আপনি দুর্বৃত্ত নন। ওদের দলের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাকে আমার সব কথা যে বলব, তারও সুযোগ পাইনি। আমার অনেক আগেই উচিত ছিল আপনাকে সাবধান করে দেওয়া। বলা উচিত ছিল—যে-লোকটাকে আপনি সঙ্গী ভেবে আপনার মনের সব কথা বলেছেন, সে-ও ওই দলেরই একজন! আপনার বন্ধু সেজে আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে সে! তার মতলব ছিল আপনারই সাহায্যে আমাকে ধরা।'

বাবা কড়কে উঠলেন, 'তুমি কী-এমন কেষ্টবিষ্টু যে তোমাকে ধরবার জন্য ওরা পাহাড়-ঘিরে এতসব কাণ্ড করবে?'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'ঠিক কথা, আমি তেমন কেউ নই। কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যাবেন—আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যেটার ওপর চোখ রেখে আমি সব কিছু দেখতে পাই, জানতে পারি। সেটার জন্যেই আমি একদিন দুর্বৃত্তদের চিনে ফেলি। সেদিন ওরা এক সওদাগরের ধনসম্পদ লুঠ করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। আমার সেই আজব জিনিসটার দৌলতে দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্র আমার চোখে পড়ে যায়! আমি চিৎকার করে উঠি। দুর্বৃত্তদের কুমতলব ভেস্তে যায়। ওরা পালাতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, পালাবার সময় ওরা আমায় দেখে ফেলে! সেই থেকে ওদের লক্ষ্য আমি! যে-রকম গোপনে লুকিয়েছাপিয়ে এই কুকর্মটি হাসিল করার ফন্দি ওরা এঁটেছিল, তাতে কারও সাধ্যি ছিল না দেখে ফেলার। কিন্তু আমার সেই আজব জিনিসটা আমার চোখে আলো ফেলে, ওই সওদাগরকে বাঁচিয়ে দিল। সেই থেকে আমাকে ধরবার জন্যে এতসব হুলুস্থুলু কাণ্ড দুর্বৃত্তদের! আমি জানি, এ-কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু ওই জিনিসটা দেখলে, আপনার অবিশ্বাস করার কিছু থাকবে না। ভাববেন, আমি বুঝি জাদুকর।'

ছেলেটার কথা শুনে জিনিসটা দেখার খুব ইচ্ছে হলেও, ছলনা করে তাচ্ছিল্যের সুরে বাবা উত্তর দিলেন, 'তাই নাকি! তবে চ', দেখি!'

তারপরেই কী মনে করে বাবা আবার বললেন, 'তোর কথামতো তেমন-কিছু দেখতে না-পেলে, আমি ছেড়ে কথা বলব না। তোকে ঠিক পুলিশে দেব।'

ছেলেটা এবার নিশ্চিন্তে আয়েশ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখলেই বুঝবেন সত্যি বলছি, না মিথ্যে। চলুন, দেখাচ্ছি।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনদিকে যেতে হবে?

ছেলেটা উত্তর দিল, 'চলুন, আমায় দেখে-দেখে চলুন। আমি যেদিকে যাই, আপনাকেও সেইদিকে যেতে হবে।'

ছেলেটার সঙ্গে বাবার পাহাড়ে ওঠা-নামা শুরু হল।

সেই বনজঙ্গলঘেরা দুর্গম পথে ওঠা-নামা করতে করতে দু'জনের এমন হাঁপ ধরে গেল কহতব্য নয়!

কারও মুখ দিয়ে কথা সরে না। ছেলেটা ছোট, তাই হাঁপিয়ে গেলেও ততটা কাহিল হয় না। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পাথর টপকাচ্ছে। সে বাবাকে পেছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেল। কিন্তু বাবার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারল না। অবশ্য বাবাকেও তো পাথর টপকাতে হচ্ছে। তাই মাঝে-মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন বাবা। তখনই, পাছে তাঁর দৃষ্টি ছেলেটার খেই হারিয়ে ফেলে, তাই তিনি হুড়োহুড়ি করে তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছিলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল একটা অঘটন।

বাবার পা হঠাৎই পিছলে গেল। তিনি পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেও, একটা পেল্লাই পাথরের আড়ালে ছেলেটা হারিয়ে গেল।

বাবা তাকে দেখতে না-পেয়ে ব্যস্তগলায় খুব চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, 'কুশল-ল-ল—'

না, এবার-আর অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। এক ডাকেই সে সাড়া দিল। সাবধানি গলায় বাবাকে দূর থেকে সতর্ক করে দিল, 'আপনি অমন চিৎকার করে ডাকবেন না। দুর্বৃত্তরা শুনতে পাবে।'

বাবা নিজের ভুল বুঝতে একটুও দেরি করেননি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলার স্বর সামলে নিলেন। চাপাগলায় বললেন, 'আমি পড়ে গেছি!'

ছেলেটা আঁতকে বলে উঠল, 'সে কী! আমি যাচ্ছি। আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি এখনই পৌঁছে যাব।'

তা, বলতে নেই, ছেলেটা মিথ্যে বলেনি। চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতেই বাবার কাছে পৌঁছে গেল। খুবই অস্থির হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লাগল?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'লাগতে পারত খুবই। ভাগ্য ভালো যে হাড়গোড় ভাঙেনি! খুব বেঁচে গেছি! তোর তো এখন তড়বড় করে পাহাড়ে ওঠা-নামার বয়েস। তোর মতো তড়বড় করা কি আমার সাজে? বাহাদুরি করতে গিয়েই পা-টা গেল টাল খেয়ে। পড়লুম হুমড়ি খেয়ে! পড়েই তোর নাম ধরে চিৎকার করে ফেলেছি।'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'ঠিক আছে, চলুন। এবার আপনার সঙ্গেই আমি আছি।'

বাবা জবাব দিলেন, 'সেই ভালো। তুই আমার সঙ্গেই থাক। এখানে জঙ্গল ভীষণ গভীর। একটু আগুপিছু হলেই, আমরা যে-কেউ হারিয়ে যেতে পারি।'

ঠিক এই সময়ে, বাবার কথা শুনতে শুনতেই ছেলেটা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। মুখখানা ভয়ে থমথম করে উঠল। নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বাবাকে ইশারায় চুপ করতে বলল। ওর হাবভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল—কান খাড়া করে যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। কারণ, বাবাও শুনতে পেলেন—জঙ্গলের এ-কোণে ও-কোণে পড়ে-থাকা শুকনো পাতার ওপর অনেক মানুষের চলাফেরার ঝমর-ঝমর শব্দ।

ছেলেটা ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। নিজের নিশ্বাসটাকে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে হাঁপাতে লাগল। তারপর বাবা যে খন্দটার ভেতর পড়ে গেছলেন, সেইখানেই দু'জনে লুকিয়ে পড়লেন।

মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরেই ছেলেটা বাবার কানের কাছে মুখ আনল। হাওয়ার চেয়েও হাল্কা স্বরে বলল, 'আপনি চেঁচিয়ে আমায় ডাকলেন বলেই এই গণ্ডগোলটা পাকাল। ওরা শুনে ফেলেছে!'

আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তেই ছেলেটা তার দাদুর ডাক শুনতে পেল, 'কুশল, কোথায় তুই? আমি তোকে কখন থেকে খুঁজছি!'

দাদুর গলা শুনে কুশল একটু চনমন করে উঠল বটে, কিন্তু সাড়া দিল না। উলটে বাবার কানে কানে বলল, 'এ আমার দাদুর গলা নয়। ওদের দলে একজন হরবোলা আছে। সে অন্যের গলা হুবহু নকল করতে পারে! আমার মনে হয়, এ তারই কারসাজি!'

বাবা অবাক হয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই ওদের এই গোপন কথাটা পর্যন্ত জেনে ফেলেছিস?'

'তবে আর বলছি কী!' ছেলেটা উত্তর দিল।

বাবা দু'-এক মুহূর্ত কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কিছু যদি মনে না-করিস, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'না-না, আমি কিছু মনে করব না। যা-খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন।' ছেলেটা জবাব দিল।

'তুই কিছু মনে না-করলেও, আমার জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে।'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'বলুন-না, আমি কিছু মনে করব না।'

'ঠিক বলছিস তো ?'

'ঠিক বলছি।'

তখন বাবা বললেন, 'দ্যাখ, এতক্ষণ আমি যাকে আমার প্রিয় সঙ্গী ভেবে তোকে খুঁজেছি, সেইসঙ্গে দুর্বৃত্তদের পাত্তা করার চেষ্টা করেছি, সেই লোকটাই যে দুর্বৃত্তদের একজন, এ-তো আমি ভাবতেই পারিনি! তুই না-বললে, আমাকে বিপদ থেকে কেউ রক্ষে করতে পারত না। লোকটা কী শয়তান বল! আর-একটু হলেই ওদের হাতে আমি ধরা পড়তুম। তাই তোকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে—তোর দাদুও আমার ওই প্রিয় সঙ্গীটির মতো দুর্বৃত্তদের কেউ নয়তো? তোর আপন দাদু তো? না, অন্য কেউ?'

ছেলেটা মুচকি হাসল বাবার কথা শুনে। তারপর বলল, 'ভয় নেই। আমার দাদু আপনার সঙ্গীটির মতো হতে যাবেন কোন দুঃখে! দাদুকে নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। সে-সব পরে বলব। শুধু একটা কথা শুনে রাখুন—আমার দাদুর মতো একজন মানুষও আপনি খুঁজে পাবেন না ভূ-ভারতে!'

ছেলেটার উত্তর শুনে বাবা বেশ লজ্জা পেলেন। লজ্জা পাবারই কথা। কেন-না, হুট করে ছেলেটার দাদুকে দুর্বৃত্তদের একজন কিনা জিজ্ঞেস করাটা যেমন ঠিক হয়নি, তেমনই তার আপন দাদু কিনা,এটা জানার ইচ্ছেটাও অমন করে না-বললেই ভালো করতেন। তার এই ভয়ানক ভুলটা বাবা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেও পেরেছেন। তাই আর দেরি না-করে ছেলেটাকে বেশ কাঁচুমাচু গলায় বললেন, 'আমি খুব অন্যায় করে ফেললুম।'

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'কী অন্যায়?'

'তোকে অমন করে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হল না। দাদু তোর নিজের, না পর—এমন কথা বলে আমি তোর মনে কষ্ট দিলুম।'

বাবার কথা শুনে ছেলেটা একজন বিজ্ঞ মানুষের মতোই উত্তরটা দিল। বলল, 'একজন সৎ মানুষ একজন অপরিচিত মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকলে, সৎ মানুষের মনে আসল-নকল নিয়ে সন্দেহ জাগতেই পারে।' তারপরেই আবার বলল, 'আমি জানি আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে আপনি ওই কথা জিজ্ঞেস করেননি। তাই আমিও কষ্ট পাইনি।'

বাবা ছেলেটার কথা বলার আদবকায়দা শুনে মুগ্ধ হয়ে ছেলেটার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এখন আমাদের কী করা উচিত? সারাক্ষণ তো আর এই খোঁদলে লুকিয়ে বসে থাকা যায় না!'

বাবার কথা শুনতে শুনতেই ছেলেটা হঠাৎ খুব সাবধানে সেই গর্তের ভেতর থেকে মাথা তুলল। বেশ সর্তক হয়েই এদিক-ওদিক উঁকি মারল। তারপর বাবার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের খুঁজে না-পেয়ে ওরা অন্যদিকে চলে গেছে! চলুন, আমরাও মানে-মানে সরে পড়ি।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে তো হল, কিন্তু যাব কোথায়?'

'যাব, যেখানে যাচ্ছি। আমাদের আস্তানায়। যেখানে আপনি যাচ্ছেন সেই আজব জিনিসটা দেখতে!' ছেলেটা উত্তর দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোনদিকে যেতে হবে?'

ছেলেটা আঙুল তুলে দেখাল, 'ওইদিকে। একটা গুহায়।'

বাবা বললেন, 'আমার কেমন-যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! তোর দাদুকে দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেছে! ওই গুহায় তো এখন তোকে একা থাকতে হবে!'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'ঠিকই বলেছেন। এখন আমি একা। আমায় একাই থাকতে হবে।'

বাবা বললেন, 'তোর দাদুকে আগে উদ্ধার করা দরকার।'

ছেলেটা জবাব দিল, 'তার আগে আপনাকে যে-জিনিসটা দেখাব বলেছি, সেটা দেখুন, সেটার গল্প শুনুন, তারপর দাদুকে উদ্ধার করার কথা ভাবব আমরা।'

ছেলেটার কথা শুনে আর তার ভাবগতিক দেখে এবার বাবা একটু অবাকই হলেন। ছেলেটা এখনই দাদুকে উদ্ধার করার কথা ভাবছে না দেখে, অগত্যা তিনি ছেলেটার কথায় রাজি হয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তাই চ', দেখি!'

ছেলেটা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চলল জঙ্গলঘেরা পাহাড়ের এক দুর্গম অঞ্চলে। বলতে কী, সেখানে গাছে-গাছে এমন ঢাকা চারদিক—দিনের আকাশেও আলো দেখা যায় না। অন্ধকার। প্রায় ঘুটঘুটে। সেই অন্ধকারে পা ফেলে ওঠা-নামা করতে করতে ছেলেটা বাবার হাত ধরল। বলল, 'চেপে ধরে থাকুন। দেখবেন, যেন ফসকে না-যায়! একটু বেসামাল হলেই আমরা কেউ-আর কাউকে খুঁজে পাব না। এখন আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের সেই গুহার কিনারায়। আর খানিকটা পথ ভাঙতে হাতে হাত শক্ত করে ধরে রাখতে হবে আমাদের। আমি যেদিকে যাই, আপনিও সেদিকে পা ফেলুন খুব সতর্ক হয়ে। হড়কালেই খাদে!'

তা, বলতে নেই, কোনও বিপদ ঘটল না। ছেলেটার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিয়ে বাবা এগিয়ে চললেন। কখন-যেন ছেলেটার হাত ধরে কেমন-একটা ভয়ংকর অন্ধগলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন!

ছেলেটা বলল, 'এইটেই আমাদের গোপন আস্তানা।'

বাবা অন্ধকারে অন্ধের মতো নাকাল হয়ে বললেন, 'কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না!'

ছেলেটা বলল, 'ভয় পাবেন না। এক্ষুনি আলো জ্বলে উঠবে। তখন আপনি সব কিছু দেখতে পাবেন। দুর্বৃত্তদের যে এত জুলুমবাজি, আমাকে ধরবার জন্যে যে এত কাণ্ড—সে তো এক্ষুনি যে-আলোটা জ্বলে উঠবে, সেটা ছিনতাই করার জন্যে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা আচম্বিতে বাবার হাত ছেড়ে দিল। বাবা অন্ধকারে হাঁকপাঁক করতে করতে চিৎকার করে উঠলেন, 'কুশল-ল-ল—'

বাবার চিৎকার শুনে ছেলেটা হেসে উঠল হো-হো করে। গুহার সেই অন্ধগলির ভেতর চিৎকার আর হাসির প্রতিধ্বনি এমন তীব্র, যেন কান ফেটে যায়! সেই প্রতিধ্বনি শেষ হবার আগেই ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড! অন্ধগলির সব অন্ধকার চোখের পলকে মুছে গেল! ঝলকে উঠল আলো! বাবা থতমত খেয়ে চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন!

এ কী! এত আলো এলো কোত্থেকে! কই, ছেলেটাকে তো সামনে-পেছনে কোথাও দেখা যাচ্ছে না! এত আলো, অথচ সে কোথায় গেল?

হ্যাঁ, তাকে দেখা গেল! সে বেরিয়ে আসছে গুহার একটা পাথরের আড়াল থেকে! সে যতই এগিয়ে আসছে, তার গা থেকে ততই ঠিকরে পড়ছে রাশি রাশি আলো!

বাবা ভয়ে আঁতকে উঠলেন। চোখ মুদে ফেললেন। হাঁক পাড়লেন, 'কে তুই?'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'আমি কুশল।' বলে সে এমন তারস্বরে হেসে উঠল, বাবার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল!

থরথর করে কাঁপতে থাকেন বাবা! ভয়ে!

কী করবেন, ভেবেও পান না।

সেই মুহূর্তে তাঁর বোধবুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়েছে!

(ক্রমশ)

সন্দেশ

প্রকাশের স্থান কলকাতা

প্রকাশকাল মাসিক

প্রকাশক সন্দীপ রায়। ভারতীয়

১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০

স্পাদক সন্দীপ রায়। ভারতীয়

১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০

সুজয় সোম। ভারতীয়

১৩/১৯ ডা নীলমণি সরকার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৯০

মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

৫২ রামমোহন রায় সরণি। কলকাতা ৭০০০০৯

ওপরের বিবরণ যথার্থ এবং সত্য।

সন্দীপ রায়

এপ্রিল ২০০৬

ছবির মজা

অমল চক্রবর্তী

মা শুভস্যারকে গরম গরম পকোড়া ও চা দিয়ে গেল। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। আড়চোখে তাকিয়ে আবার অঙ্ককষায় মন দিলাম।

শুভস্যার গরম পকোড়ায় কামড় দিয়ে বললেন, 'বা! পকোড়াটা তো বেশ জম্পেশ!' তারপর চায়ে দিলেন লম্বা একটা চুমুক : 'যা-ই বলিস, এত ভালো চা সচরাচর কলকাতায় মেলে না।'

আমি ফিক্ করে হেসে ফেললাম।

'বুঝলি, সেবার নীলগিরিতে এরকম চা খেয়েছিলাম। আ-হা, কী দারুণ স্বাদ! পাহাড়ে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—দু'-পাশে চা-বাগান—গন্ধে মন-প্রাণ ভরে যায়! বুঝলি তো, রাস্তার ধারে এক চায়ের দোকান। এক দক্ষিণী সেই দোকান চালান। দুধ ছিল না। লিকার-চা। চিনি দিলেন। কী স্বাদ—আ-হা! চা খেতে খেতে বিউটিফুল একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'নীলগিরিতে চায়ের স্বপ্ন?'

'নীলগিরি আর আসামে চা হয়, আর দার্জিলিং!'

নে, অঙ্কখাতা দেখা।... হ্যাঁ-রে, এটা কোন দোকানের চা?'

ঠিক তখুনি মা ঘরে ঢুকল, আর-এক প্লেট পকোড়া নিয়ে। বলল, 'এ তো দার্জিলিং-এর চা। যদি পিওর হয়, দার্জিলিং-চা সব দোকানেই ভালো।'

'চা-টা বানায় কী করে, বৌদি?'

শুভস্যার কলকাতায় একা থাকেন। হাত-পুড়িয়ে রান্না করেন। চা-টা খান দোকানে। পল্টু বলেছিল।

মা বলল, 'কচি পাতায় চা হয় না। চা-পাতার দোকানে প্রসেসড্ শুকনো-চা পাওয়া যায়। ওটাই কিনবেন। রাখবেন টিনের কৌটোয়। কাচ বা প্লাস্টিকে খুব তাড়াতাড়ি গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।'

'চা-টা বানাব কী করে? আগে লিকারটাই শিখি। সহজ, সোজাসাপটা।'

'তাহলে দার্জিলিং চা-টাই কিনুন। জল ফুটতে দিন। একটা চীনামাটির চা-পাত্রে এক চামচ চা-পাতা মেপে রাখুন।'

'রাখলাম।'

'কাপে এক চা-চামচ চিনি দিন। জল ফুটছে টগবগ করে... ব্যস, চা-পাত্রে গরম জল ঢেলে, চাপা দিন। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।'

'করলাম।'

'ছাঁকনি দিয়ে কাপে লিকার ছেঁকে নিন। ছোট চা-চামচ দিয়ে চিনিটা গুলে নিন।'

'নিলাম। আহ্-হ্!... আচ্ছা, অপু চা খেতে পারে না?'

'পারেই তো। অল্প করে, আর হাল্কা-গরম। শুনেছি তো... রিসার্চ বলছে—চা খেলে হার্ট ভালো থাকে। বেশি খেলে অক্ষিধে হয়। আর বেশি-গরম পাকস্থলীতে আলসার তৈরি করতে পারে।'

'বৌদি, প্লিজ, আর-এক কাপ। অপুর জন্যেও।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সামনে গরম আসছে। তখন তো অপু খাবে বরফ-দেওয়া আইসড্-টি!'

'তা-ও বানানো যায়?' শুভস্যার অবাক!

'গরমটা আরও পড়ুক, শিখিয়ে দেব।'

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : সমীর সরকার

চায়ের পাঁচালি

রাজশ্রী চক্রবর্তী

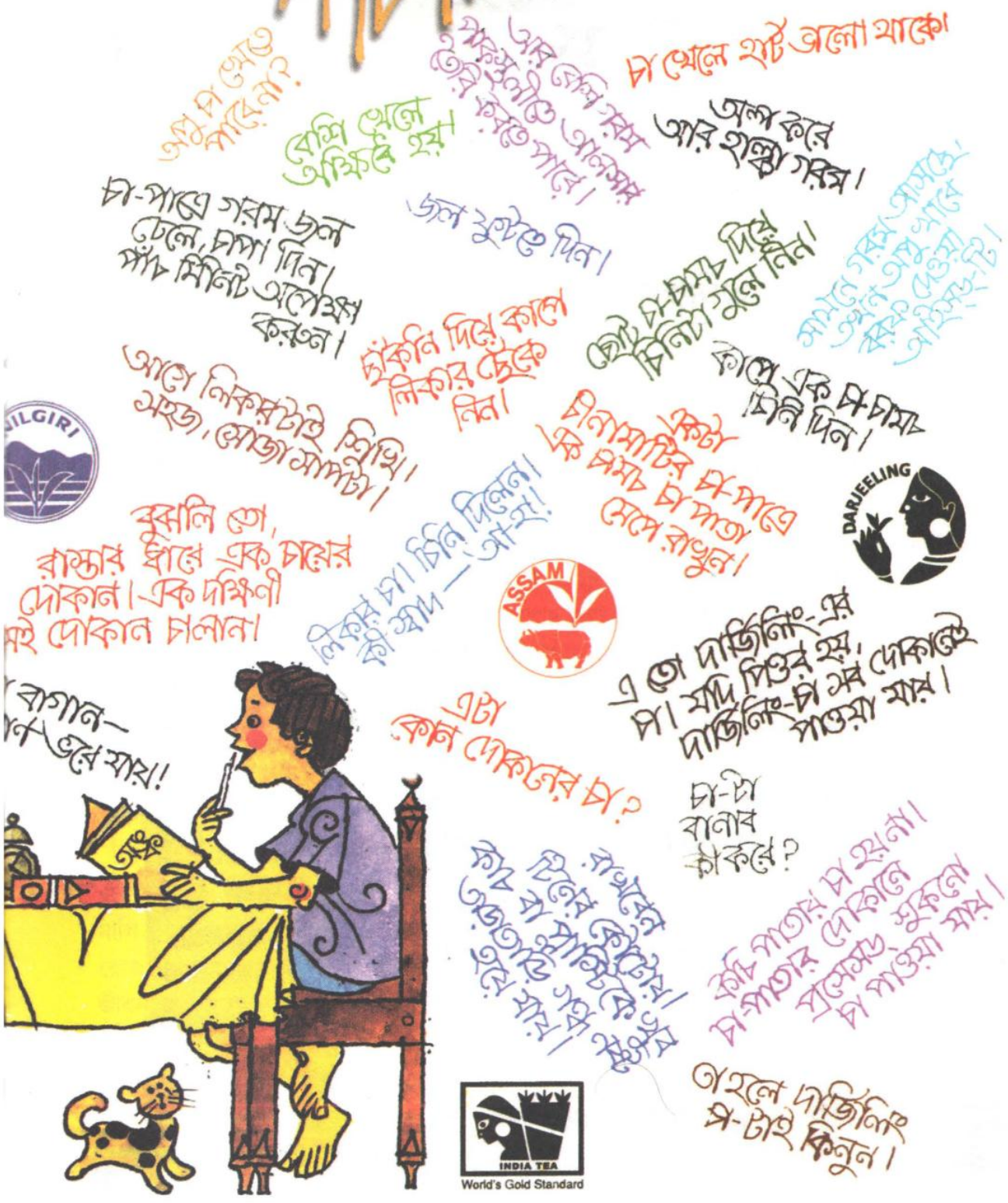

আকাশছোঁয়া গাছ

অনিরুদ্ধ দেব

অনেকদিন আগে, অনেক দূরের দেশে একটা বাগান ছিল। বিশাল বড় বাগান। বিখ্যাত বাগান। বিখ্যাত, কেন-না সেই বাগানে অনেকরকম গাছপালা ছিল, অনেকরকম ফুল হত, ফল হত। দূর-দূরান্ত থেকে দেশ-বিদেশের মানুষ সেই বাগান দেখতে আসত। সেই বাগানের মালিও খুব নামকরা লোক ছিল। সবাই যখন তার বাগান দেখে ধন্য-ধন্য করত, তখন মালির বুক গর্বে ভরে উঠত। যখন লোকে তাকে বলত—তারা অনেক দূরের দেশ থেকে বাগানের নাম শুনে এসেছে, তখন তার খুব গর্ব হত। যখন লোকে অবাক হয়ে দেখত তার বাগানে হাজার-হাজার রকমের ফুল, গাছ, ঘাস যত্ন করে সাজানো আছে, তখন তার গর্ব হত। এ-সব গর্ব হবার মতো কথা বইকী। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি গর্বের কারণ—এই বাগানেই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গাছ।

বাগানের উত্তরের কোনায় এই গাছটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। তার মাথা কত লম্বা, কেউ জানত না। শুধু পাখিরা জানত। পাখিরা উড়ে উড়ে ও—ওই উঁচুতে চলে যেতে পারত কিনা!

গাছটারও খুব গর্ব ছিল। সে বুঝতে পারত অনেক অনেক দূর থেকে লোকজন তার ছবি নিতে আসে। তারা যখন এসে বলত, 'বাঃ! কী বিশাল গাছ!'—তখন তার বুক ফুলে উঠত। তার মনে হত—সে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী গাছ।

কিন্তু গাছটার মনের কোনায় একটু দুঃখও ছিল। তার দুঃখ—সে আকাশকে ছুঁতে পারত না।

গাছটার মনের সাধ ছিল আকাশটা ছুঁয়ে দেখে। ইচ্ছে করত তার ডালপালা দিয়ে নীল আকাশের গায়ে হাত বোলায়। মন চাইত মেঘগুলোকে তার ডালপালা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। রোজ সে আর-একটু লম্বা হত। রোজ সে তার ডালপালাদের বলত হাত বাড়িয়ে আকাশকে ছুঁতে। ডালপালারা তাদের ডাল আর পাতা মেলে দিত আকাশের দিকে। কিন্তু পারত না। রোজ রাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাছ ঘুমোতে যেত, আর পরদিন আর-একটু চেষ্টা করত আকাশটা ছুঁতে।

গাছটা একদিন মালিকে কাছে ডাকল। বলল, 'শোনো, বলি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আর বেশিদিন বাঁচব না। কিছুদিন পরেই আমার সারা গা ফুলে-ফুলে ভরে যাবে। প্রত্যেকটা ফুল থেকে একটা করে ফল হবে। আর প্রত্যেকটা ফল পাকার পর তা থেকে তুমি পাবে অনেকগুলো করে বীজ। বেছে নেবে সবচেয়ে বড় বীজটা। ওটাকে পুঁতে যত্ন করে জল দেবে। যত্ন করে সার দেবে। সেটা থেকে আর-একটা বড় গাছ হবে। হয়তো সেটাই হবে আকাশছোঁয়া গাছ।'

যেমন কথা, কিছুদিনের মধ্যেই গাছটা ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেল। ফুল থেকে হল কত ফল। ফল পেকে ঝরে যাবার কিছুদিন পর গাছটা মরে গেল। মালি সেই ফলগুলো নিয়ে তার থেকে বীজ জোগাড় করল। বেছে নিল সবচেয়ে বড় বীজটা। সেটাকে যত্ন করে মাটিতে পুঁতে রোজ জল দিত, সার লাগাত। কিছুদিন পরে তা থেকে একটা ছোট্ট চারা বেরোল। মালি সেটাকে জীবন দিয়ে আগলে রাখত। আর, আস্তে আস্তে গাছটা একদিন তার মা-গাছের চেয়েও লম্বা হয়ে উঠল।

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গাছ!

না, এই গাছটাও আকাশকে ছুঁতে পারল না।

এরমধ্যে মালিও বুড়ো হয়েছে। একদিন তার ছেলেকে নিয়ে গেল গাছটার কাছে। বলল, 'খোকা, এই গাছটা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গাছ। এর আগের গাছটাও পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ছিল, তবে এই গাছটা তার চেয়েও লম্বা। কিন্তু গাছটা আকাশছোঁয়া নয়। এর দেখাশোনা করিস। একদিন এই গাছটায় অনেক ফুল হবে। প্রত্যেকটা ফুল থেকে একটা করে ফল হবে। আর প্রত্যেকটা ফল পাকার পর তা থেকে পাবি অনেকগুলো করে বীজ। বেছে নিবি সবচেয়ে বড় বীজটা। ওটাকে মাটিতে পুঁতে যত্ন করে জল দিবি। যত্ন করে সার দিবি। সেটা থেকে আর-একটা বড় গাছ হবে। হয়তো সেটাই হবে আকাশছোঁয়া গাছ।'

কিছুদিন পরে মালি মারা গেল। ছেলে হল মালি।

নতুন মালি তার বাবার কথামতো কাজ করল। গাছের যত্ন করল, দেখাশোনা করল। একদিন সেই গাছে অনেক ফুল হল। ফুল থেকে ফল হল। সব ফল পাকার পরে গাছ মরে গেল। নতুন মালি সব বীজ নিয়ে তার থেকে সবচেয়ে বড় বীজটা বেছে নিল। সেটাকে যত্ন করে মাটিতে পুঁতে, রোজ জল দিত, সার লাগাত। কিছুদিন পরে তা থেকে একটা ছোট্ট চারা বেরোল। মালি সেটাকে জীবন দিয়ে আগলে রাখত। আস্তে আস্তে, গাছটা একদিন তার মা-গাছের চেয়েও লম্বা হয়ে উঠল।

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গাছ!

না, এই গাছটাও আকাশকে ছুঁতে পারল না।

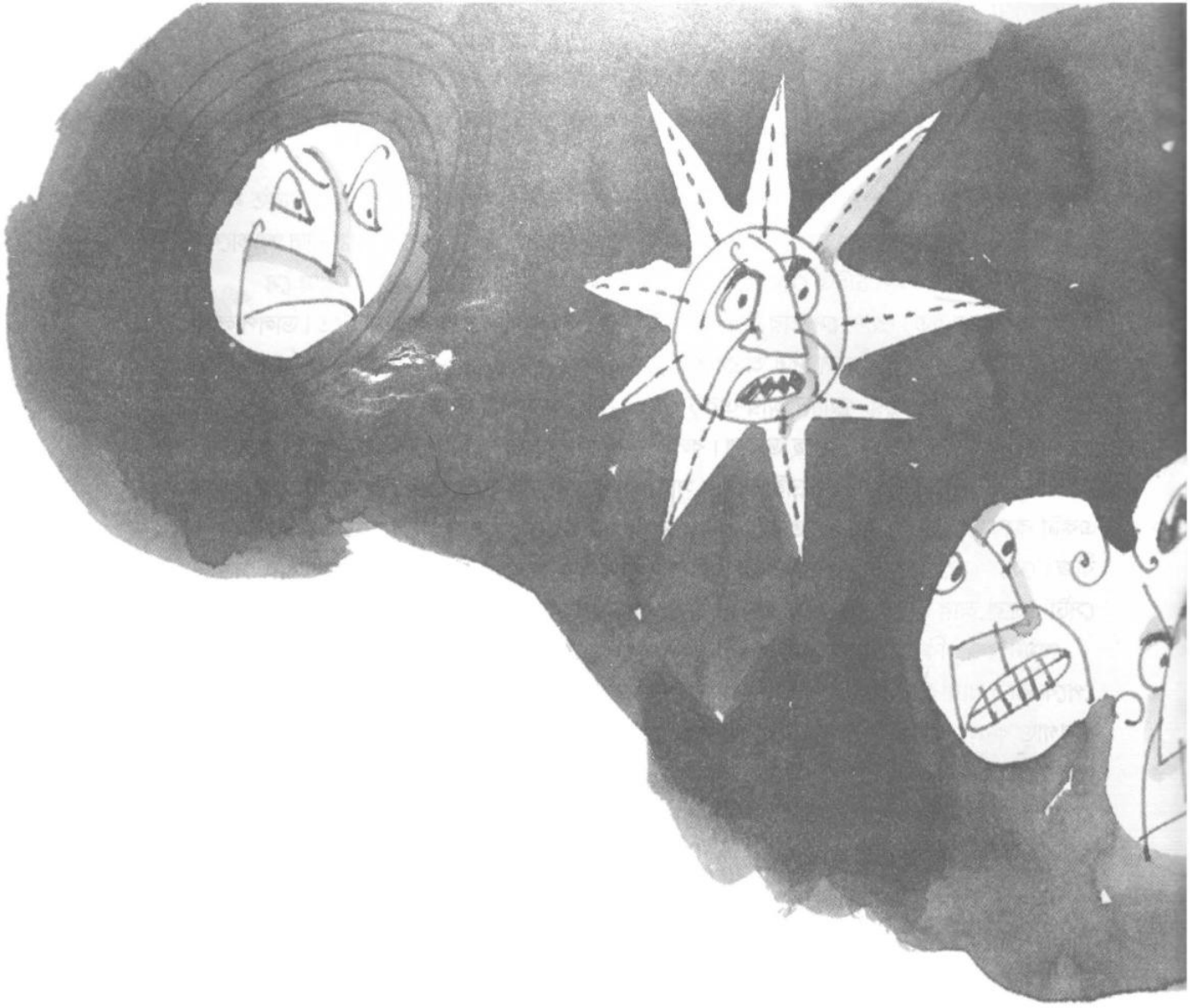

এমনি করে প্রত্যেকটা গাছের বাচ্চাই আরও আরও লম্বা হয়ে উঠল। প্রত্যেকটাই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গাছ! আর মালিরা তাদের ছেলেদের শিখিয়ে যেত কীভাবে গাছের দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু গাছেরা কেউই আকাশকে ছুঁতে পারল না। তবু তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল।

শেষে, একদিন, একটা গাছ সত্যি-সত্যিই এত লম্বা হয়ে উঠল—সে আকাশকে ছুঁয়ে ফেলল!

সবার সে কী আনন্দ! গাছের এত আনন্দ, সে ডালপালা নেড়ে নাচতে থাকল। মালির এত আনন্দ, সে ছুটে গিয়ে গ্রামের সবাইকে খবর দিল। গ্রামের লোকেদের এত আনন্দ, তারা সেই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে দিল। আর তারপর দেশ-বিদেশ থেকে লোকে ছুটে এলো সেই আকাশছোঁয়া আশ্চর্য লম্বা গাছ দেখতে। তাদের সবার কী আনন্দ, সবাই কী খুশি!

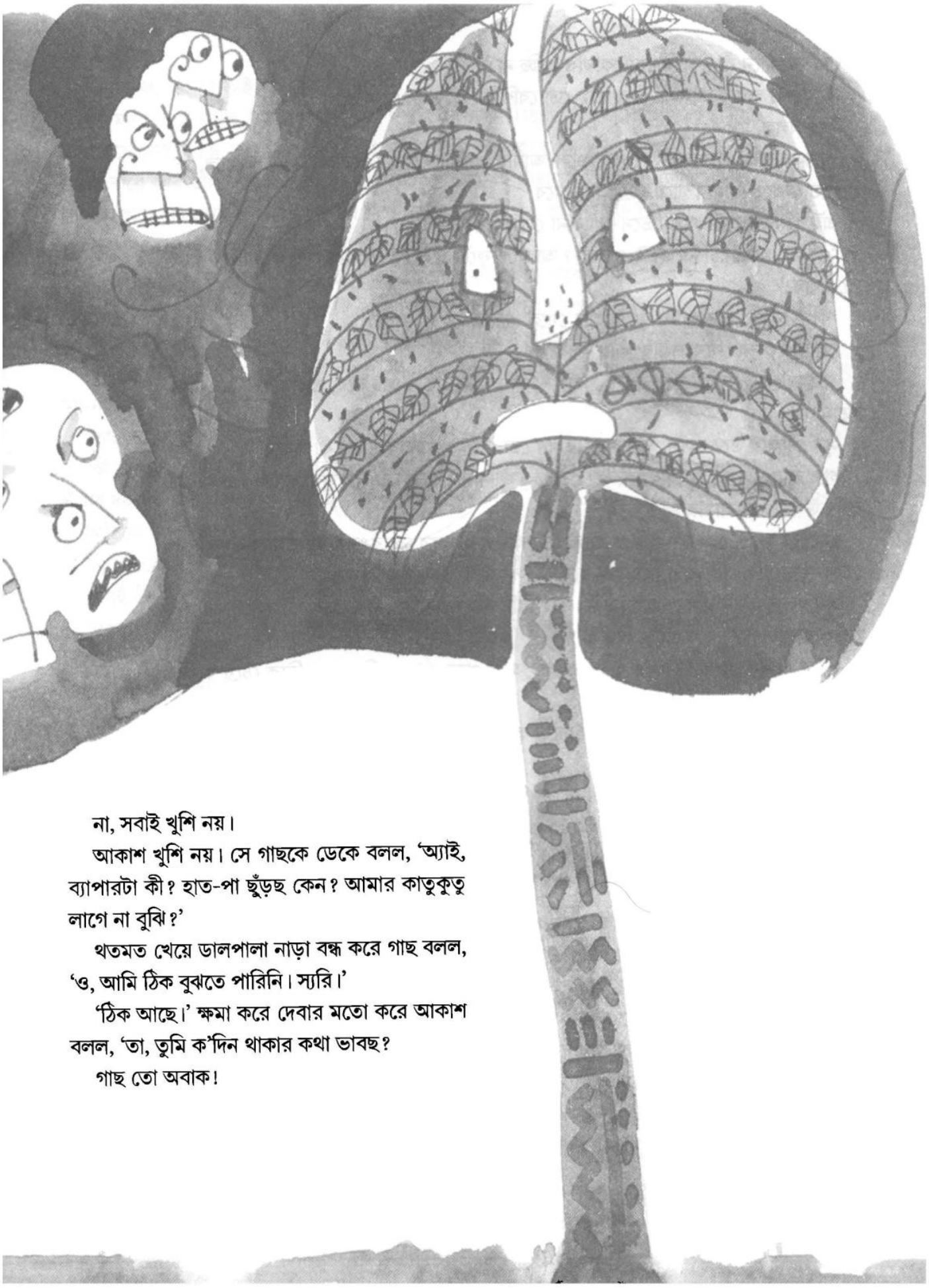

না, সবাই খুশি নয়।

আকাশ খুশি নয়। সে গাছকে ডেকে বলল, 'অ্যাই, ব্যাপারটা কী? হাত-পা ছুঁড়ছ কেন? আমার কাতুকুতু লাগে না বুঝি?'

থতমত খেয়ে ডালপালা নাড়া বন্ধ করে গাছ বলল, 'ও, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। স্যরি।'

'ঠিক আছে।' ক্ষমা করে দেবার মতো করে আকাশ বলল, 'তা, তুমি ক'দিন থাকার কথা ভাবছ?

গাছ তো অবাক!

'ক'দিন মানে কী? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না!'

আকাশও অবাক! বলল, 'কিন্তু তুমি তো বেশিদিন এইভাবে থাকতে পারবে না!'

গাছ বলল, 'কেন?'

আকাশ বলল, 'তোমার ডালপালাগুলো আমাকে খোঁচাচ্ছে যে! এইরকম চলতে থাকলে, দেখতে দেখতে আমার গায়ে ফুটো হয়ে যাবে!'

এই কথা শুনে আকাশে ভেসে-বেড়ানো মেঘেরা দৌড়ে এলো।

'সে কী! ব্যাপারটা কি এতই গুরুতর? আকাশে ফুটো হলে তো আমরা সেই ফুটো দিয়ে গলে পড়ে যাব!'

'কী সর্বনাশ!' চাঁদ বলল, 'ফুটো হয়ে গেলে আমিও-যে পড়ে যাব!'

'আমিও!' দূর থেকে গম্ভীরগলায় বলল সূর্য।

গাছ অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি যদি জানতাম এত ঝঞ্ঝাট হবে, তাহলে তো এত লম্বা হতাম না!'

সূর্য খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'বেশ তো, এখন তো জেনেছ। এবার ভাবো কী করবে।'

গাছ আরও লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা তো ঠিক জানি না! আমি বড় হয়ে লম্বা হয়েছি। এখন ছোট হবার উপায় তো আমার জানা নেই।'

মেঘেরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'সে-বললে কী করে চলবে? জানো, আমরা যদি আকাশ থেকে পড়ে যাই, পৃথিবীতে আর বৃষ্টি হবে না! সব প্রাণী শুকিয়ে মরে যাবে!'

সূর্য বলল, 'আমিই সব প্রাণের সৃষ্টিকর্তা। আমি যদি ফুটো দিয়ে পড়ে যাই, তাহলে পৃথিবী শুধু অন্ধকার হয়ে যাবে না, প্রাণহীন হয়ে যাবে।'

সবার পেছন থেকে উঁকি মেরে চাঁদ বলল, 'আমি পড়ে গেলে কবিরা কার দিকে চেয়ে কবিতা লিখবে?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'চুপ। বাজে কথা বোলো না তো। কবিতা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না।'

গাছ হাতজোড় করে বলল, 'চেঁচিও না। আমি বলি কী—তোমরা যদি কোনওভাবে এই খোঁচা-দেওয়া ডালগুলো কেটে দিতে পারো, তাহলে আর আকাশের ভয় থাকবে না। যদি কখনও আমার ডালগুলো লম্বা হয়ে আবার আকাশের গায়ে খোঁচা লাগে, তাহলে আবার কেটে দিলেই হবে। কী বলো?'

'এটা ভালো বুদ্ধি।' মেঘেরা বলল, 'আমরা গিয়ে ঝড়ের মেঘদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওদের কাছে বিদ্যুৎ আর বাজ আছে। তা দিয়ে তোমার ডালপালা কেটে দেওয়া যাবে।'

'বাঃ! তাহলে তো হয়েই গেল।' গাছ বলল, 'যদিও আমি পৃথিবীর প্রথম গাছ—যে আকাশকে ছুঁতে পেরেছে, কিন্তু কোনও গণ্ডগোল চাই না। আকাশকে ছুঁয়ে না-থাকলেও আমার চলবে।'

মেঘেরা তাড়তাড়ি গিয়ে কালো মেঘদের ডেকে আনল।

আকাশ তাদের কাছে জানতে চাইল, 'তোমরা বিদ্যুৎ দিয়ে গাছটার ডালপালা একটু ছেঁটে দিতে পারো?

সূর্য হঠাৎ হাত তুলে বলল, 'দাঁড়াও। গাছটার ডালপালা ছেঁটে দেওয়াটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

চাঁদ বলল, 'কেন? তাই তো ঠিক হল।'

সূর্য মাথা নেড়ে বলল, 'ভেবে দ্যাখো। এই গাছটা খুব ভালো। তাই এককথায় ডালপালা ছাঁটাতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু ডালপালা ছাঁটতে গেলে ওর ব্যথা লাগবে। তখন যদি ও বলে— পরের বারে আর ডালপালা ছাঁটতে দেব না? তাহলে কী হবে? তাছাড়া এই গাছটা তো চিরদিন বেঁচে থাকবে না। তখন ওর জায়গায় ওর বাচ্চা বেড়ে উঠবে। ওর বাচ্চারা যদি ওর চেয়েও লম্বা হয়? ওরা যদি ডাল ছাঁটতে না-দেয়, তখন?

আকাশ চিন্তিতমুখে বলল, 'ঠিক। তখন আমার গায়ে ফুটো হয়ে যাবে!'

'আর সেই ফুটো দিয়ে যদি পড়ে যাই, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে মরে যাবে।' সূর্য বলল।

'আর সেই ফুটো দিয়ে আমরা যদি পড়ে যাই, তাহলে পৃথিবী শুকিয়ে যাবে।' মেঘেরা বলল।

'আর সেই ফুটো দিয়ে আমি পড়ে গেলে, কবিরা...' বলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে চাঁদ বলল, 'না-না, ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'তাহলে কী করা?' জানতে চাইল আকাশ।

'কী আর করা!' সূর্য বলল, 'আমার মতে একটা জিনিসই করার আছে। বিদ্যুৎকে বলো, ডালপালা ছাঁটার দরকার নেই, একেবারে মেরেই ফেলুক গাছটাকে।'

আঁতকে উঠল চাঁদ!

'একেবারে মেরে ফেলবে? আহা রে, বেচারা বেশ ভালোমানুষ! আমি অবশ্য বেশি কথা বলিনি।'

সবাই ভীষণ রেগে চাঁদের দিকে ফিরে তাকাল।

'তাহলে তুমি কী চাও? আকাশের গায়ে ফুটো হয়ে যাক? আর আমরা সবাই তা দিয়ে পড়ে যাই?

'না, তা নয়...' মিনমিন করে বলল চাঁদ।

'তাহলে চুপ করো। আমাদের কাজ করতে দাও।'

ঘন কালো মেঘ ছেয়ে এলো আকাশে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। মেঘের গর্জনে চারদিক কেঁপে উঠল। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশ চিরে। গাছ আকাশের দিকে তাকিয়ে তার লম্বা ডালপালাগুলো মেলে ধরল, যাতে বিদ্যুৎ সেগুলোকে ছোট করে দিতে পারে।

কিন্তু বিদ্যুৎ এসে আছড়ে পড়ল গাছের ঠিক মাঝখানটাতে। গোটা গাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল। তার সবকটা পাতা ঝরে গেল। ডালপালাগুলো ঝলসে সাদা হয়ে কুঁকড়ে গেল। মরে গেল গাছটা।

সেইজন্যই পৃথিবীতে আর-কোথাও আকাশছোঁয়া গাছ পাওয়া যায় না।

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

হাত পাকাবার

বদমাশ খরগোশ রিখিয়া ভুক্ত গ্রাহক সংখ্যা ৪০৯৫। বয়স ৯ বছর

একটা বাঘ ছিল। একদিন সে বনে শিকার করতে গেল। কোনও শিকার না-পেয়ে যখন সে ফিরে আসছিল, তখন হঠাৎ শুনতে পেল একটা কান্নার স্বর। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল বাঘটা। যেখান থেকে শব্দটা আসছিল, সেখানে গিয়ে দেখল যে, একটা খরগোশছানা একটা বটগাছের তলায় বসে কাঁদছে। দেখে বাঘটার খুব মায়া হল। সে ভাবল, মানুষ যেমন গোরু-ছাগল পোষে, তেমনি আমিও এটাকে পুষব।

বাঘমশাই তখন ঘরে নিয়ে এসে নিজের বাচ্চাদের মতো খরগোশছানাকে মানুষ করতে লাগল।

এদিকে খরগোশছানাটা বড় হয়। সে বাঘের ছানাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে, শিকারে যায়। একদিন সে বুঝতে পারল যে, সে বাঘদের সঙ্গে আছে। বুঝতে পেরে তার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। সে ভাবল, বাঘদের জব্দ করতেই হবে। কিন্তু সে কোনও বুদ্ধি খাটাতে পারল না।

এরপর একদিন বাঘের চারটে বাচ্চা, তাদের মা আর খরগোশছানাটা মিলে শহরে সার্কাস দেখতে গেল। গিয়ে দেখল বাঘের খেলা হচ্ছে। আর বাঘগুলো যেই রেগে যাচ্ছে, অমনি একটা লোক সরু দড়ির মতো কী-একটা দিয়ে বাঘদের মারছে। আর বাঘগুলো অমনি যন্ত্রণায় চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছে। এইসব দেখে খরগোশটা একটা ফন্দি আঁটল।

সার্কাস থেকে বেরিয়ে খরগোশটা জল খাবার নাম করে সার্কাসের অফিসে গিয়ে ওরকম একটা দড়ি লুকিয়ে নিয়ে চলে এলো। বাড়ি এসে সেটা একটা আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রাখল। পরদিন সকালেই বাঘকে ডেকে তুলে যেই মারতে যাবে, অমনি বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার পা ধরে টেনে টেনে নদীর ধারে গিয়ে, খরগোশকে নদীতে ফেলে দিল।

সেই নদীতে একটা কুমির থাকত। খরগোশকে দেখে সে ভাবল—আজকের ব্রেকফাস্টটা মন্দ হবে না। এই ভেবে সে জলের তলা থেকে কাঁটাচামচ, ছুরি, প্লেট এ-সব নিয়ে এসে... না, তারপর আর কোনওদিন ওই খরগোশছানাকে কেউ দেখেনি।

আসর

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

রহস্যে-ঘেরা বনবাংলো

মধুরিমা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ৪৪১৩। বয়স ১১ বছর

গল্পটা শুরু করার আগে টুকুর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। টুকুকে দেখতে বেশ আদুরে ধরনের। একটু বেঁটেখাটো। কোঁকড়ানো চুল। চোখে কেমন-যেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ছোঁয়া। নাকটা একটু ভোঁতা মতন। গালে একটা লাল আভা আছে। গায়ের রঙ দুধের মতো ধবধবে ফরসা। ওর মতো গেছোপাকা ছেলে দেখা যায় না! সব ব্যাপারে ওর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কত আর বয়স! পাঁচ পেরিয়ে ছ'-এ পা দিয়েছে। ও সেন্ট জন্‌স স্কুলে পড়ে। কলকাতার দমদমে 'মণিকা এপার্টমেন্ট'-এর একটা ফ্ল্যাটে থাকে।

ওর পরিচয় দেওয়া তো হল, এবার শুরু করছি সেই রহস্যজনক গল্প।

টুকুর পুজোর ছুটি পড়েছে। ওর মা-বাবা খুব বেড়াতে ভালোবাসে। কিন্তু টুকুর কাছে বেড়াতে যাওয়া মানেই বছরে দু'-বার সোনারপুরে ওর মামার বাড়িতে—অন্য কোথাও না। টুকুর বাবা ওকে পড়ার ঘরে যেতে বলে ওর মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। টুকু পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে বাবা-মায়ের কথা শুনতে লাগল। ভেবেছিল মামাবাড়িই বেড়াতে যাবার গতি। কিন্তু ওর ভাবনা বদলে গেল বাবার কথা শুনে!

বাবা বলছেন, 'শুনেছি মধুপুর জায়গাটা খুব সুন্দর। চলো, ওখানেই ছুটিটা কাটিয়ে আসি। রবিকে গাড়িটা ধুতে বলি। সেরকম বুঝলে কালই বেরিয়ে পড়ব।'

মোহনা চক্রবর্তী

গ্রাহক সংখ্যা ১১২৬। বয়স ১৪ বছর

টুকুর মুখ উজ্জ্বল। দেখতে দেখতে পরেরদিনের সকাল এসে গেল। ও ঘুম থেকে উঠে পড়ল।

টুকু তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গ্যারেজে-রাখা গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। রবিকে (ড্রাইভার) গ্যারেজে আসতে দেখে ও গাড়ির মেঝেতে ইচ্ছে করে বসে পড়ল। ওদিকে ওর বাবা-মা ওকে খুঁজে পাচ্ছে না। শেষকালে গাড়ির মধ্যে দেখে ওরা হেসে ফেলল।

রবি গাড়ি স্টার্ট করল। ছ'-ঘণ্টা পরে মধুপুর এসে গেল। টুকুর বাবা গাড়ি থেকে নেমে হোটেল খোঁজার জন্য হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করল। মধুপুরের প্রায় শেষ প্রান্তে চোখে পড়ল একটা বনবাংলো। বনবাংলোর পরিবেশ বেশ সুন্দর। টুকুর বাবা মোবাইলে ওদের গাড়িকে ফোন করে তাড়াতাড়ি বনবাংলোয় আসতে বলল। গাড়ি দশ মিনিটের মধ্যেই চলে এলো বনবাংলোতে।

টুকুরা দোতলায় দুটো ঘর নিল। বেডরুমটা সুন্দর। আর উত্তরদিকে একটা ছোট ব্যালকনি, যেখান দিয়ে বাগানের চারপাশের শোভা দেখা যায়। আর একটা ড্রয়িংরুম। মধুপুরের হাতিপুর জঙ্গল ওরা দেখতে যাবে ঠিক করল। টিকিট কেটে ঢুকল হাতিপুর জঙ্গলে। ওখানে হরিণ, হাতি দেখতে পেল। দুপুরবেলা বনবাংলোয় ফিরে এলো।

সেদিন দুপুর থেকে সন্ধে ও সন্ধে থেকে রাত হল। টুকুরা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক রাত দেড়টার সময় গাড়ির হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। কেউ শুনতে পায়নি, কিন্তু টুকু ঠিক শুনতে পেল। ও ঘুমোতে পারল না। ভোর হতেই উত্তরের ব্যালকনিতে চলে গেল।

আশ্চর্য! কেউ কোথাও নেই! ধু-ধু-ধু করছে সারা বাগান। কয়েকজন দারোয়ান বাঁশি বাজাচ্ছে। টুকু নীচে নেমে এসে দেখল রবি গাড়ি ধুচ্ছে।

টুকু বলল, 'আচ্ছা রবিকাকু, কাল রাত দেড়টার সময় তুমি গাড়ির হর্ন বাজিয়েছিলে?'

রবি বলল, 'তখন তো আমি ঘুমোচ্ছিলাম ছোট সাব।'

টুকুরা আজ গোবিন্দহাটির মন্দিরে যাবে। কাল রাতের কথা টুকু ভেবেই চলেছে। রবিও কেমন অন্যমনস্ক। সকাল ন'-টার সময় ওরা পৌঁছে গেল গোবিন্দহাটির মন্দিরে। টুকুর বাবা আর মা ফোটো তুলতে ব্যস্ত। রবি আগের দিন রাতে কী কী ঘটেছিল, তা জানতে চাইল। টুকু সবিস্তারে খুলে বলল। রবির চোখ জ্বলে উঠল।

গোবিন্দহাটির মন্দির থেকে ফিরে রবি আর টুকু পুরো বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। হঠাৎই বনবাংলোর বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে ওরা কতকগুলো হাতির দলকে দেখল। ওদের ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল, অপেক্ষা করতে লাগল সেদিন রাতের জন্য।

সেদিন রাতে টুকু জেগে রইল, এমনকী রবিও। ঠিক দেড়টার সময় টুকু গাড়ির হর্নের আওয়াজ পেল। টুকু আস্তে আস্তে উঠে ঘরের দরজা খুলে রবির কাছে নীচের তলায় চলে গেল। পর্দার আড়াল থেকে ওরা দেখতে লাগল।

প্রথমে দেখল একটা লরি ঢুকল বনবাংলোতে। লরি থেকে অনেক জিনিস নীচে নামানো হল। বনবাংলোর ম্যানেজার সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অনেকগুলো হাতি দুলতে দুলতে এলো। ওদের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল মালের বোঝা।

হাতিগুলো দুলতে দুলতে অনেকদূর চলে গেল। লরিটাকেও আর দেখা গেল না। বনবাংলোর ম্যানেজার আর কয়েকজন লোক ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার ফিরে এলেন গুচ্ছ গুচ্ছ টাকার নোট নিয়ে।

ভোর চারটে বাজতেই বনবাংলোর গেটের দরজা খুলে গেল। কাউকে কিছু না-বলে টুকু আর রবি বেরিয়ে পড়ল।

টুকু রবিকে বলল, 'আগে থানায় চলো।'

কাছাকাছি একটা থানা খুঁজতে এমন কিছু দেরি হল না।

টুকু আর রবি সোজা ও-সির কাছে গেল। খুলে বলল সব ঘটনা। ও-সি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি লোক পাঠালেন বনবাংলোতে, ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

ঠিক ন'-টার সময় পুলিশের জিপ ঢুকল বনবাংলোতে। পুলিশ ম্যানেজারকে জিপে উঠতে বলল। ওদিকে টুকুর বাবা-মা ওকে খুঁজে না-পেয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো পুলিশের জিপে উঠল।

বনবাংলোর ম্যানেজারকে সব স্বীকার করতে হল শেষপর্যন্ত। টুকুর বাবা-মা ওকে পেয়ে খুশি।

ও-সি বললেন, 'আপনার ছেলের জন্য একটা বিশাল চোরাকারবারকে ধরতে পেরেছি। মধুপুর থেকে মাল পাচার হত বিষ্ণুপুরে, সেটা ধরা পড়ে গেল। আপনার ছেলের বুদ্ধির জন্য ওকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আপনারা আর-একদিন থেকে যান মধুপুরে।'

ওসি উদগ্রীব হয়ে অনুরোধ করলেন।

টুকুর মা-বাবা হাসল।

রবি বলল, 'মধুপুরে এবার কোথায় থাকবেন? আরও দু'-তিনদিন থাকবেন তো?'

টুকু হেসে বলল, 'বনবাংলোতে!'

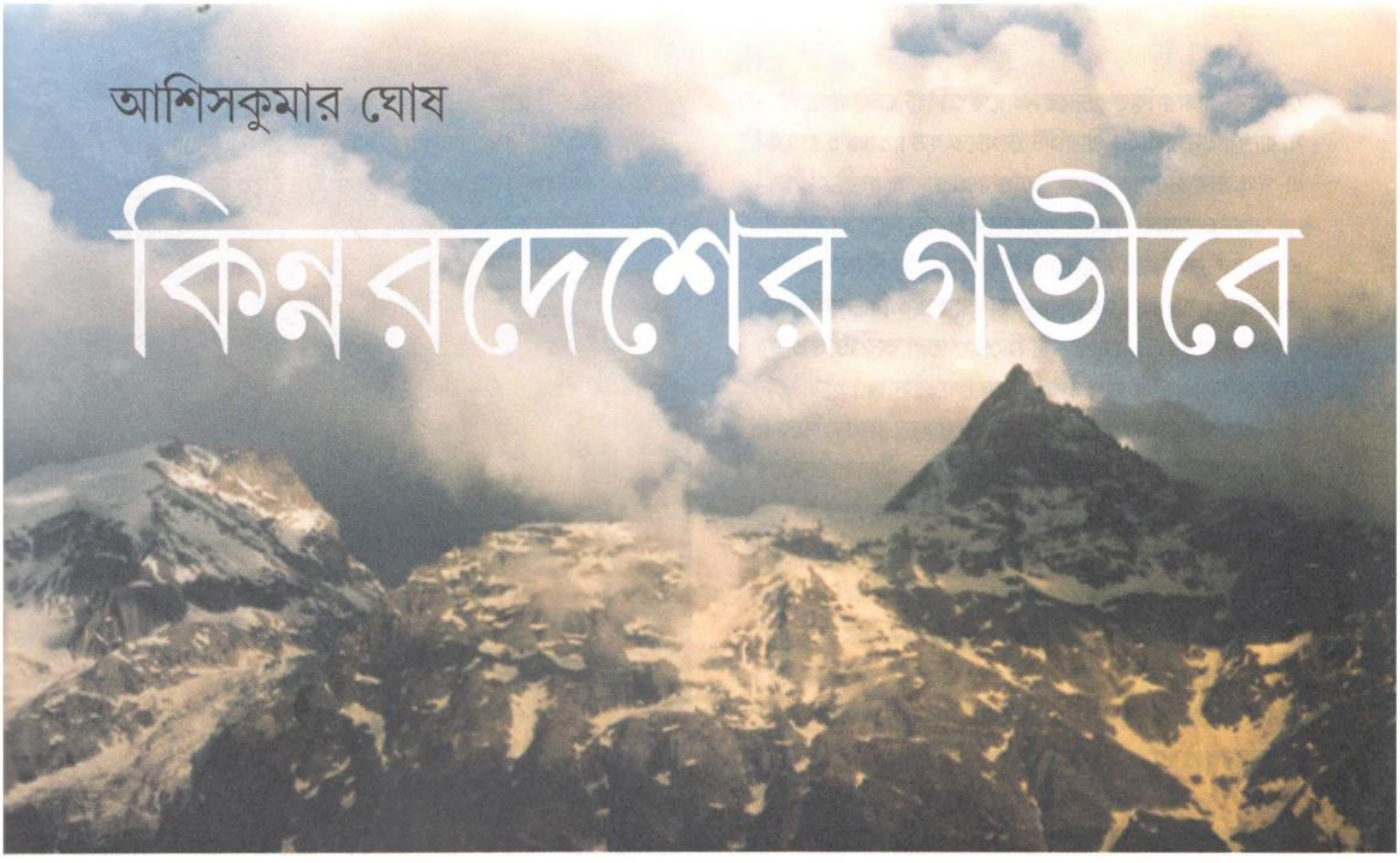

আশিসকুমার ঘোষ

কিন্নরদেশের গভীরে

সারাহান থেকে যাত্রা শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে গেল। আজ আমরা কিন্নরের গভীরে প্রবেশ করব। দুটো দিন কেটে গেছে রামপুর আর সারাহান পরিক্রমায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের 'কিন্নর দেশে' বইটা সুদেষ্ণাদির থেকে চেয়ে নিয়ে আমার কাছে রেখেছি। একটু একটু করে পড়ছি আর ভাবছি—এই ভদ্রলোক ৫০-৬০ বছর আগে কী সাংঘাতিক কষ্ট করে হাঁটাপথে কিন্নরভ্রমণ করেছিলেন! এ-পথের সৌন্দর্য স্বর্গের কাছাকাছি! আর কিন্নরের অধিবাসীদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই রাহুল সাংকৃত্যায়ণ লিখেছিলেন, 'কিন্নর বা কিম্পুরুষদের দেশে যাওয়াও যা, আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়াই তাই—একই কথা।'

স্বর্গের পথে আজ আমাদের ঠিকানা সাংলা। সারাহান থেকে ১৭ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে, ফিরে আসি জাতীয় সড়ক এন এইচ ২২-এ, জায়গাটার নাম জিয়োরি। এবারে শতদ্রু তথা সাতলেজ নদীর হাত ধরে এগিয়ে চলা।

সুদেষ্ণাদি অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেনি। তাই জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি আর কিন্নর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবে না?'

'দু'-চোখ ভরে প্রকৃতি দেখলেও, ভাবছিলাম পুরাণের কথা, ইতিহাসের কথা।' সুদেষ্ণাদি বলল। ইতিহাসের শিক্ষিকা ওরফে ভ্রমণবিশারদ ট্রেকার।

'বটে!'

'অনেকে বলে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর নাকি কিন্নরে কেটেছিল। তবে অসাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে যে-দু'টি বিষয় তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হলো এখানকার নারী-পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য আর নৃত্য-গীতপ্রিয়তা। এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আর সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সমন্বয় ও সহাবস্থান। প্রতিটা গ্রামেই দেখবে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ গুম্ফার অবস্থান। এমনকী একই মন্দিরে হিন্দু দেবতার সঙ্গে বুদ্ধমূর্তিও!'

ইতিমধ্যে আমরা ওয়াংটু ব্রিজ (১৮৩০ মিটার) পেরিয়েছি। জিয়োরি থেকে ওয়াংটু ৩৭ কিলোমিটার। ২০০০ সালে এই ব্রিজ শতদ্রুর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। নতুন ব্রিজ পার হয়ে আমাদের পথ বাঁ-দিকে। এই ওয়াংটুকেই বলা হয় 'গেটওয়ে অব কিন্নর'। অর্থাৎ, সিমলা জেলা পেরিয়ে আমরা কিন্নর জেলায় প্রবেশ করছি। এরপরেই টাপরি। এখানে চায়ের তেষ্টা পেয়ে গেল আমাদের। তাই মিনিট কয়েকের বিরতি। টাপরিতে

দোকান-বাজার কিছু রয়েছে। আগে ওয়াংটু চেক পোস্টে যাত্রীদের ইনারলাইন পারমিট দেখাতে হত। ১৯৯৩ থেকে এ-পথ ভারতীয়দের জন্যে উন্মুক্ত।

এখনও আমরা শতদ্রুর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। দূরে বয়ফচুড়ো একবার উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেল। আমরা পৌঁছে গেলাম করছাম। ওয়াংটু থেকে করছামের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। করছামে শতদ্রু ও বসপা নদী মিশে গেছে। রাস্তাও ভাগ হয়ে গেছে। একটা দক্ষিণপূর্ব দিকে গেছে, সাংলা হয়ে ছিটকুল। আর অন্য রাস্তাটা রেকং পিও হয়ে কল্পার দিকে। এবার আমরা ঘোলাজলের শতদ্রুকে ছেড়ে নীলজলের উচ্ছল বসপার সঙ্গী।

করছাম থেকে সাংলা ২২ কিলোমিটার। আমরা সাংলা ভ্যালি তথা বসপা ভ্যালিতে প্রবেশ করছি। সাংলা উপত্যকা যেন কোনও শিল্পীর আঁকা আশ্চর্য ছবি! স্বচ্ছ নীলজলের চঞ্চলা বসপা নদীপাথরে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে অনন্ত যৌবনের প্রতীক হয়ে। নদীর দু'-ধারে সবুজ ও হলুদ ধাপচাষের শষ্যক্ষেত্র। এপ্রিকট, পিচ, আপেল, চিলগোজা,

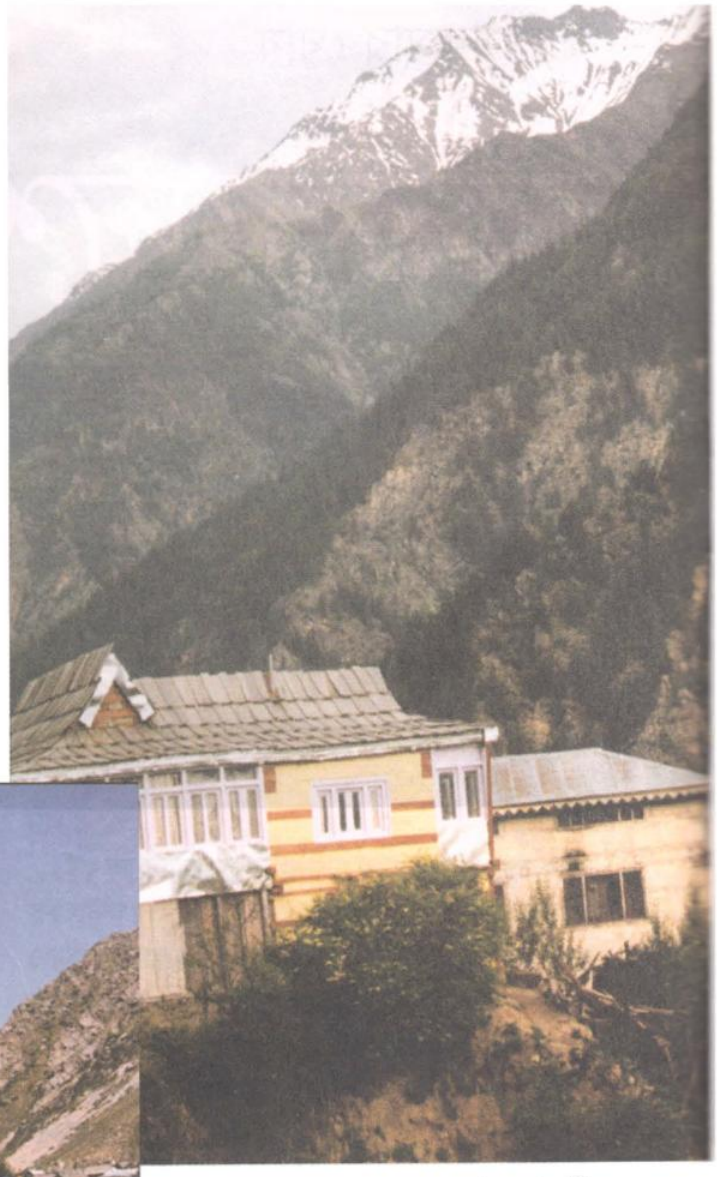

সাংলার প্রকৃতি

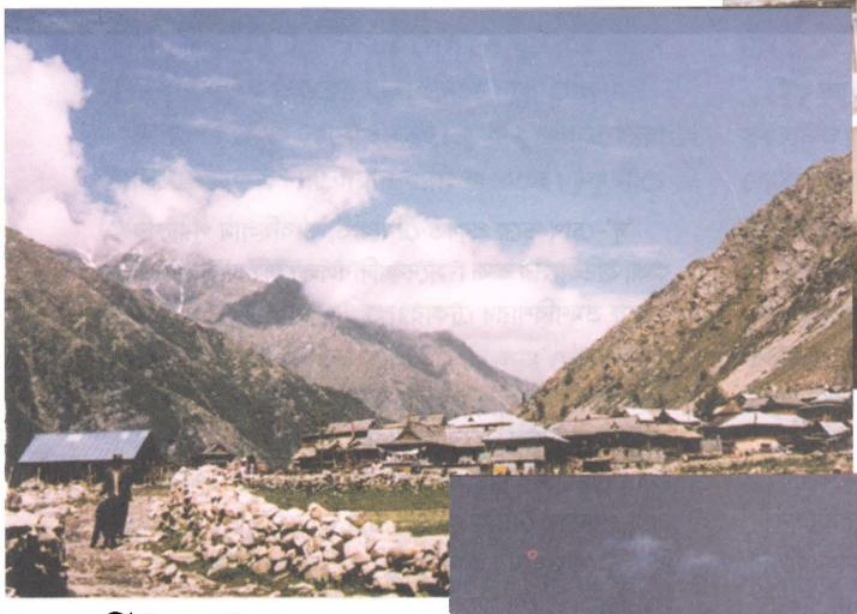

ছিটকুল গ্রাম

কল্পার প্রকৃতি

নাসপাতি, আঙুরের বাগান। পাহাড়ের গায়ে চির, পাইন, ফারগাছের জঙ্গল, কাঠ-পাথরের তিব্বতি-ধাঁচের গ্রামীণ বাড়ি, আর মাথার ওপর অভ্রংলিহ হিমালয়ের তুষারমৌলি। সাংলার হিমালয় গেস্টহাউস-এ আমাদের বাসস্থান ঠিক হয়েছে। মালপত্র রেখে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার সাংলার পথে।

রাস্তায় নেমেই প্রথমে দেখলাম একপাল ভেড়া। বিশাল মেষবাহিনীর সঙ্গে দু'জন গদ্দী মেষপালক ও একটা কুকুর। এই কুকুরই ওই ভেড়ার পালের প্রধান রক্ষাকর্তা। ভেড়ার গায়ে হাত দিতেই কুকুরটা তেড়ে এলো।

সাংলার উচ্চতা ২৬৮০ মিটার। ঠাণ্ডা হাওয়ার বেশ দাপট। পাহাড়ি গ্রামের গা-বেয়েই শুরু হয়েছে ধাপ-কাটা চাষের জমি। ফলের বাগানে আপেল, নাসপাতির রমরমা। জুন মাসে এখনও আপেল তৈরি হয়নি। যদিও ছোট ছোট আপেল আর নাসপাতিগাছ ছেয়ে রয়েছে। রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে বসপা নদী রয়ে যাচ্ছে।

বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি এলাকাটা বেশ জমজমাট। এখানে দোকানপাট, হোটেল, রেস্তরাঁ, বাংলো, ভিডিও পার্লার সবই আছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সুদেষ্ণাদি বলল, 'এখানে বেশিরভাগ কাজকর্ম মেয়েরাই করছে। হোটেলে, দোকানের কাউন্টারে, সবই মেয়েরা বসছে—এটা লক্ষ করেছ তো?... এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। কিন্নরী মেয়েরা খুবই পরিশ্রমী। সংসার চালানোর দায়িত্বও মেয়েদের। বিয়ের অনুষ্ঠানে কর্তৃ হিসেবে উপস্থিত হন সেই পরিবারের বয়স্ক মহিলা। তবে ইতিহাসের পাতায় যে কিন্নরীদের দ্রৌপদী-প্রথা—অর্থাৎ, একাধিক স্বামীগ্রহণ প্রথার কথা বলা হয়, সেটা আজ প্রায় লুপ্ত।'

রাস্তার ঢাল বেয়ে পায়ে-চলার পথ পাহাড়ি গ্রামের মধ্যে দিয়ে। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বছর পনেরোর এক কিন্নরী। তার ছুটে-ছুটে ওই ঢালুপথে চলার সঙ্গে আমরা তাল রাখতে পারছি না। আমাদের অবস্থা দেখে তো সে হেসে কুটোপাটি। ফলের আর ফুলের বাগান গ্রামের মধ্যেই রয়েছে। সাংলার আর-একটা বৈশিষ্ট্য কাঠের কাজ-করা পাথরের ছাদের তিব্বতি-স্টাইলের বাড়িঘর।

নামতে নামতে বসপা নদীর ধারে। নদীর ওপারে ঘন সবুজ উপত্যকা—চির, পাইন, উইলো, বার্চগাছের ঘন জঙ্গল আর সাদা বরফমোড়া শৃঙ্গের ওপর সূর্যের আলোর চিকচিক।

আমরা এখন সাংলার বিখ্যাত বেরীনাগ মন্দিরের সামনে। মন্দিরের গম্বুজ সোনালি রঙের। বেরীনাগের মন্দিরের পাশেই একটা বৌদ্ধ গুম্ফা। শোনা গেল, একই পূজারি এই দু'টি মন্দিরেই পুজো করেন। বেরীনাগের মন্দির কাঠ ও পাথরে তৈরি। এই প্রাচীন মন্দির ছাড়িয়ে, নদীর ওপর ঝোলানো পুল পেরিয়ে ট্রাউট মাছচাষ কেন্দ্র।

সুদেষ্ণাদি এক কিন্নরী মহিলার সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। আমরা এখন খাড়াই পথে ফেরার রাস্তা ধরেছি। কিন্নরী মহিলা পথের এক বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফেরার পথে সুদেষ্ণাদি বলতে লাগল, 'কিন্নরে সারা বছরে প্রায় একশোটা উৎসব হয়। কিন্নরকে তাই 'উৎসবের দেশ'ও বলতে পারো। সবচেয়ে বড় উৎসব ফুলেইচ উৎসব। এটা হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।' বুঝলাম, এইসব খবর ওই কিন্নরী রমণীর কাছ থেকে সুদেষ্ণাদি জোগাড় করেছে।

আমরা বড় রাস্তায় উঠে এসেছি। বেলা প্রায় পাঁচটা। তবে সূর্যের আলো এখনও বেশ প্রখর। সাংলা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের মাথায় আশ্চর্য একটা গ্রাম কামরু। এই পথে এক কিলোমিটার গাড়িতে গেলেও, বাকি পথটা হেঁটেই যেতে হবে। জাফরান, আপেল, এপ্রিকটের বাগান-ঘেরা বড় সুন্দর গ্রাম। বুশহর রাজ্যের একদা-রাজধানী এই কামরু।

পর্যটকমহলে এখন কামরুর প্রধান আকর্ষণ পাঁচতলা দুর্গামন্দির। তিব্বতি শৈলীর এই স্থাপত্যকলা দেখার মতো! এখানে কামাখ্যা মন্দির, বদরীনাথের মন্দির আর বৌদ্ধ গুম্ফাও আছে। আগুন লেগে এই দুর্গামন্দিরের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে।

সাংলার আকাশে সূর্যদেবের বিদায়উৎসব, তারসঙ্গে কিন্নর-কৈলাশের অপরূপ রূপসুধা পান—এই পাহাড়ের শীর্ষ থেকে খুবই উপভোগ করা গেল। উঠতেই ইচ্ছে করছে না।

সুদেষ্ণাদি জিজ্ঞেস করল, 'বইটা কতদূর পড়লে?'

'অনেকটা এগিয়েছি। একটু বরং পড়ে শোনাই।'

সঙ্গেই ছিল 'কিন্নর দেশে'। খুলে পড়তে থাকি: 'বেরিয়ে পড়লাম শোভঠোভ থেকে সাংলার পথে। এ রাস্তাও প্রায় সমতল। বিশেষ চড়াই উৎরাই নেই। কিছুদূর এগোবার পরই চোখে পড়ল সবুজ শোভায় ভরা শতক্রুর ওপারের তট। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। ঠিক যেন পাড়ের ওপর সবুজ মখমলের কাজ করা।... সাংলা বেশ বড় গ্রাম।'

পরেরদিন তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়েছি। সারাদিনে দুটো বাস চলে সাংলা থেকে ছিটকুল। তবে ইচ্ছেমতো চলা-থামার জন্যে গাড়ি ভাড়া করেই আমরা যাচ্ছি। ভারত-তিব্বত সীমান্তের শেষ গ্রাম এই ছিটকুল—সাংলা থেকে ২৬ কিলোমিটার—অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতি যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে—আকাশচুম্বী বরফমোড়া পাহাড়, নীল আকাশ, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, পাহাড়-বেয়ে নামা ঝরনার কলতান, পাইন-চির-ফারগাছের বন্যা! রয়েছে নির্জনতা, সেই নির্জনতা ভেঙে ভেড়ার পাল নিয়ে গদ্দীদের বিচরণ।

সাংলা থেকে সাত কিলোমিটার এগিয়ে বানজারা ক্যাম্প (২৭০০ মিটার)। ক্যাম্পের হলুদ রঙের তাঁবুগুলো দেখেই মনে হয়—থেকে যাই একটা দিন। বসপা নদীর ধারেই চারদিকে পাহাড়-ঘেরা এই ক্যাম্প-রিসর্টটা থাকা-খাওয়া ছাড়াও ট্রেকিং, মাছধরা, প্যারাগ্লাইডিং ইত্যাদির সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতেও সাহায্য করে। আরও প্রায় সাত কিলোমিটার এগিয়ে রকছাম। একের পর এক পাহাড়ি ঝরনা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। কয়েকটা ঝরনা জমে বরফ হয়ে গেছে। রকছামেও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে (৩০৫০ মিটার)—রুপিন রিভার গেস্টহাউস।

বসপা নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে আবার সামনে বিশাল ভেড়ার পাল, এবং তাদের রক্ষাকর্তা বিশাল দুটো কুকুর। গাড়ি প্রায় দশ মিনিট আটকে রইল। রকছাম থেকে আরও ১১ কিলোমিটার এগিয়ে ছিটকুল। উচ্চতা ৩৪৫০ মিটার। ছিটকুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্বর্গীয় আভায় দীপ্তিময়! বসপা নদীর তীরে পাইন-দেওয়ার বনে-ঘেরা হিমালয়ের অসাধারণ সৌন্দর্যের স্মৃতি সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। বসপা নদীর উৎস ছিটকুলেরই নী-লা (পাসের) বরফগলা জল থেকে। রজতশুভ্র গিরিরাজি-ঘেরা সবুজ চারণভূমি—এই ছিটকুলের মোহময় শান্ত সমাহিত রূপ ভোলার নয়। ঘাসের মধ্যে প্রিমুলা আর পপি যেন সবুজ তৃণভূমিকে রূপান্তরিত করেছে পারস্য গালিচায়। মাথার ওপর উড়ে যায় ম্যাগপাই পাখির ঝাঁক। রোদের মধ্যেও ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নীল আকাশে বিরাজ করছে জোরখানদেন গিরিশৃঙ্গ, বাঁ-দিকে রালডং আর লিও-পারগিল গিরিশ্রেণী।

নদীর জল ছুঁয়ে এবার ছিটকুল গ্রামের পথ ধরি। একটা বৌদ্ধমন্দির, আর একটা হিন্দুমন্দির প্রায় পাশাপাশি রয়েছে ছিটকুলে। সেই হিন্দু-বৌদ্ধ মিলনের ট্র্যাডিশন ছিটকুলের সমাজজীবনেও রয়েছে। ছিটকুলের জনসংখ্যা মাত্র ৬০০। মেষপালন আর সামান্য চাষবাস মানুষের প্রধান জীবিকা। তবে সামরিক বাহিনীর জওয়ানের স্ত্রীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে এই গ্রামে বাস করেন, যখন তাঁদের স্বামীরা সীমান্তে কর্তব্যপালন করছেন। গ্রামের বাড়িগুলো সব কাঠের মাথায় পাথরের ছাদ। গ্রামের ধারে বোর্ডে রয়েছে ছিটকুল গ্রামের নানা পরিসংখ্যান, চোরাশিকারিদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারি।

সুদেষ্ণাদি গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জানাল, 'ছিটকুল কিন্নর জেলার শেষ গ্রাম, ওপারে তিব্বত—এখন চীন। আগে ব্যবসা-বাণিজ্য হত এ-পথে । এখানকার মানুষ তিব্বতে ব্যবসা করতে চলে যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। এখন সেই আদানপ্রদান ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্যের বিষয়—এখানে শিক্ষার হার শতকরা প্রায় একশো ভাগ।'

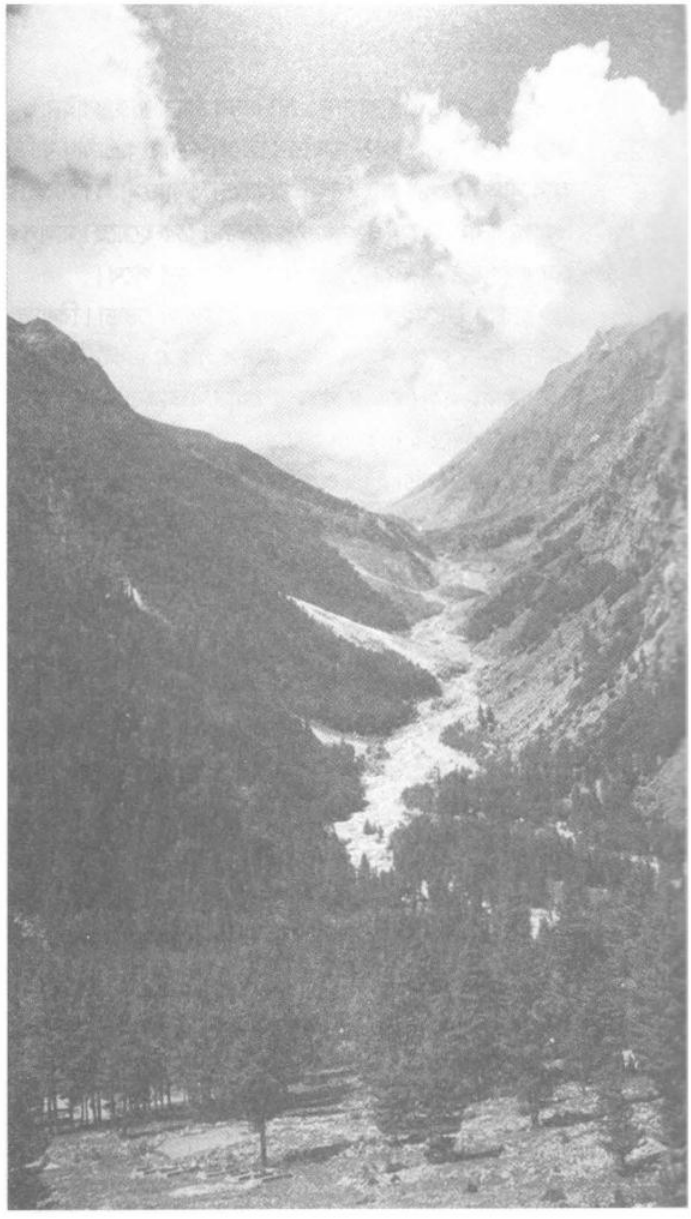

জমে-থাকা ঝরনা। ছিটকুলের পথে

সাংলায় দুপুরের খাওয়া সেরেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়া, যাচ্ছি কিন্নরের মধ্যমণি কল্পায়। যেতে যেতে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করি, ' আচ্ছা, কিন্নরের সদরদপ্তর কি কল্পা?'

'না, আগে কল্পাতে ছিল, ১৯৯২ থেকে রেকং পিও। স্থানীয় মানুষের কাছে রেকং বাদ দিয়ে, শুধু পিও।'

'সাংলা থেকে কতদূর এই পিও শহর?'

'সাংলা থেকে পিও ৩৮ কিলোমিটার। পিও থেকে কল্পা আরও ১৩ কিলোমিটার।'

সাংলা থেকে একই পথে করছাম ফিরে এসে, আমাদের গাড়ি এন এইচ ২২-এ—অর্থাৎ, হিন্দুস্তান-টিবেট রোড ধরল। এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। রাস্তার শ্যামলিমা

কমে যাচ্ছে, ফুটে উঠছে রুক্ষতা। নজরে এলো কপিকলের সাহায্যে শতদ্রু নদী পার হওয়ার এক অভিনব দৃশ্য! এসে গেল পাওখারি—এই এলাকার একমাত্র পেট্রল পাম্প। পাওখারি থেকে রেকং পিও সাত কিলোমিটার। এবার জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁ-হাতে রাজ্য সড়কে ঢুকে পড়ল গাড়ি। রেকং পিওর উচ্চতা ৭৪৩৩ ফুট। দোকানে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে, কী সাজানো-গোছানো শহর, দোকানপাট, রকমারি পোশাকে নারীপুরুষ। আর সবার ওপরে বিরাজমান কিন্নর-কৈলাশ!

ড্রাইভার জানালেন, 'গাড়ি একটু গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে। এরমধ্যে আপনারা দেখে নিতে পারেন দুর্গামন্দির, বুদ্ধমূর্তি আর গুম্ফা।'

আমরা পায়ে হেঁটে পিও-কে অনুভব করার একটু চেষ্টা করি। পাইন আর দেবদারু-ঘেরা শহর, আর সব সময়ের সাক্ষী কিন্নর-কৈলাশ। পিও-তে এই বৌদ্ধ গুম্ফা নির্মাণের ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৯২ সালে দলাই লামার উপস্থিতিতে কালচক্র উৎসব উপলক্ষে তৈরি হয় এই বৌদ্ধ গুম্ফা। গুম্ফার পাশেই বিশাল বুদ্ধমূর্তি। তবে দুর্গামন্দিরে যেতে হলে দু'-কিলোমিটার হেঁটে 'কোঠি'তে যেতে হবে।

রেকং পিও থেকে গাড়ি এবার চড়াই পথ ধরেছে। শীতও বাড়ছে। চকচকে রোদ ছিল, দশ মিনিটের মধ্যে মেঘ চারদিক ঢেকে দিল। পিও থেকে কল্পা ১৩ কিলোমিটার। পাইন আর ফারগাছ রাস্তার দু'-ধারে। আপেল বাগানের তো শেষ নেই। এখানকার আপেল নাকি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আপেল। তবে জুন মাসে এখনও আপেল পাকার সময় হয়নি। আপেল ছাড়াও রয়েছে চিলগোজা, আখরোট আর কাঠবাদাম গাছ। আঙুর এবং নানা ধরনের বেরির ফলনও এখানে ভালো।

কল্পার আপেল

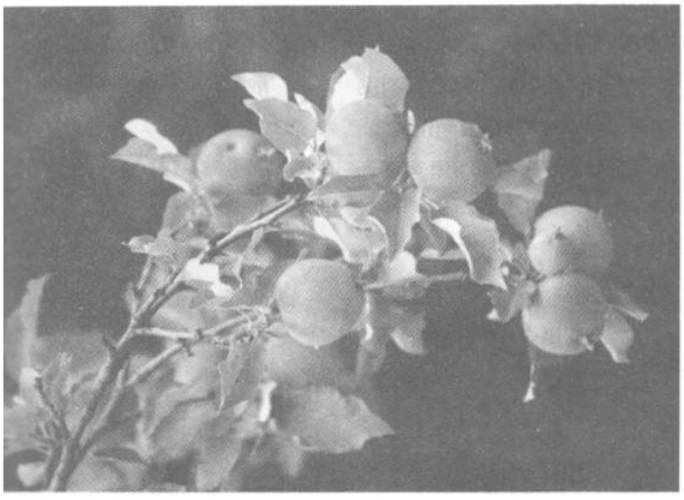

কিন্নরকে 'স্টোরহাউস অব কোয়ালিটি ফ্রুটস' বললে বাড়িয়ে-বলা হবে না।

৪৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম দেওদার-চির-পাইনে ঘেরা কল্পায়। কল্পার উচ্চতা ২৯৩০ মিটার। মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে। এমন মেঘ-রোদ্দুরের খেলা কিন্নর-কৈলাশ এবং আশপাশের তুষারশৃঙ্গগুলোকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে তুষারাবৃত পাহাড়গুলো যেন এক মেলবন্ধনে বাঁধা। না, তুষার আর সবুজের এই সাঁকো সহজে মেলে না। সবুজের মধ্যে শুধু অরণ্যপ্রকৃতি নয়, রয়েছে ফল ও ফুলের আশ্চর্য সমাবেশ!

এই বিকেলে আমরা এখন কল্পার পথে পথে। কল্পায় গাড়ি করে সাইট সিয়িং করতে হয় না। হাঁটতে হাঁটতেই পাওয়া যায় অপার প্রকৃতি! তুষারমৌলি হিমালয়। পাইন, ফার, চিনারের জঙ্গল। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে বাড়িঘর, মন্দির, গুম্ফা। সেইসঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের আশ্চর্য আবহসংগীত!

হাঁটতে হাঁটতে সুদেষ্ণাদি বলল, 'স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী শীতকালে স্বয়ং মহাদেব কল্পায় বাস করেন। এই সময়ে অন্য দেবতারা এখানে আসেন মহাদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। মাঘ মাসে তাই এখানে একটা মেলাও হয়। তবে কল্পার সেরা উৎসব আর মেলা হল 'ফুলেখ'।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেছি কল্পার বিষ্ণুমন্দিরে। ঝলমলে তিব্বতি শৈলীতে এইসব হিন্দুমন্দির তৈরি। তবে মন্দিরের দরজা বন্ধ। বিগ্রহ দেখা হল না। দেখা হল হু-বুলান-কার বৌদ্ধ গুম্ফাটি। তারপর আমরা আপেলবাগানে নেমে পড়ি। কিন্নর-কৈলাশে রঙ ধরছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এ-সূর্যাস্ত যেন শ্বেত মর্মরে লেলিহান অগ্নিশিখা! শৃঙ্গের নীচে একটা পাথরের স্তম্ভকে স্থানীয় মানুষ বানাসুরের শিবলিঙ্গ হিসেবে কল্পনা করেন। সারাদিনে ওই স্তম্ভের রঙ নাকি বার বার পাল্টে যায়, আমাদের সেটা দেখা হয়নি। তবে শেষবেলার পাহাড়ে রঙের হোলি খেলা যা দেখলাম, তাতেই আমরা সম্মোহিত! স্থানীয় এক মানুষ বললেন, 'কিন্নর-কৈলাশের রূপ এর থেকেও ভালো পাবেন দু'-কিলোমিটার দূরে চিনি ফরেস্ট রেস্টহাউস থেকে।' না, চিনি ফরেস্ট রেস্টহাউসে আমাদের যাওয়া হয়নি।

সুদেষ্ণাদিকে জিজ্ঞেস করি, 'এই কিন্নর-কৈলাশ পরিক্রমা ব্যাপারটা কী, বলতে পারো?'

সুদেষ্ণাদি বলল, 'কিন্নর-কৈলাশের শৃঙ্গের কিছুটা নীচে যে বানাসুরের শিবলিঙ্গ বলে কথিত পাথরের স্তম্ভটা দেখছ, সেটা কালো গ্রানাইট পাথরে তৈরি। বাইনোকুলার বা শক্তিশালী জুম লেন্সে দেখলে আরও ভালো বুঝতে পারবে। ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় এই পাথরের গায়ে সূর্যের আলো পড়ে কখনও

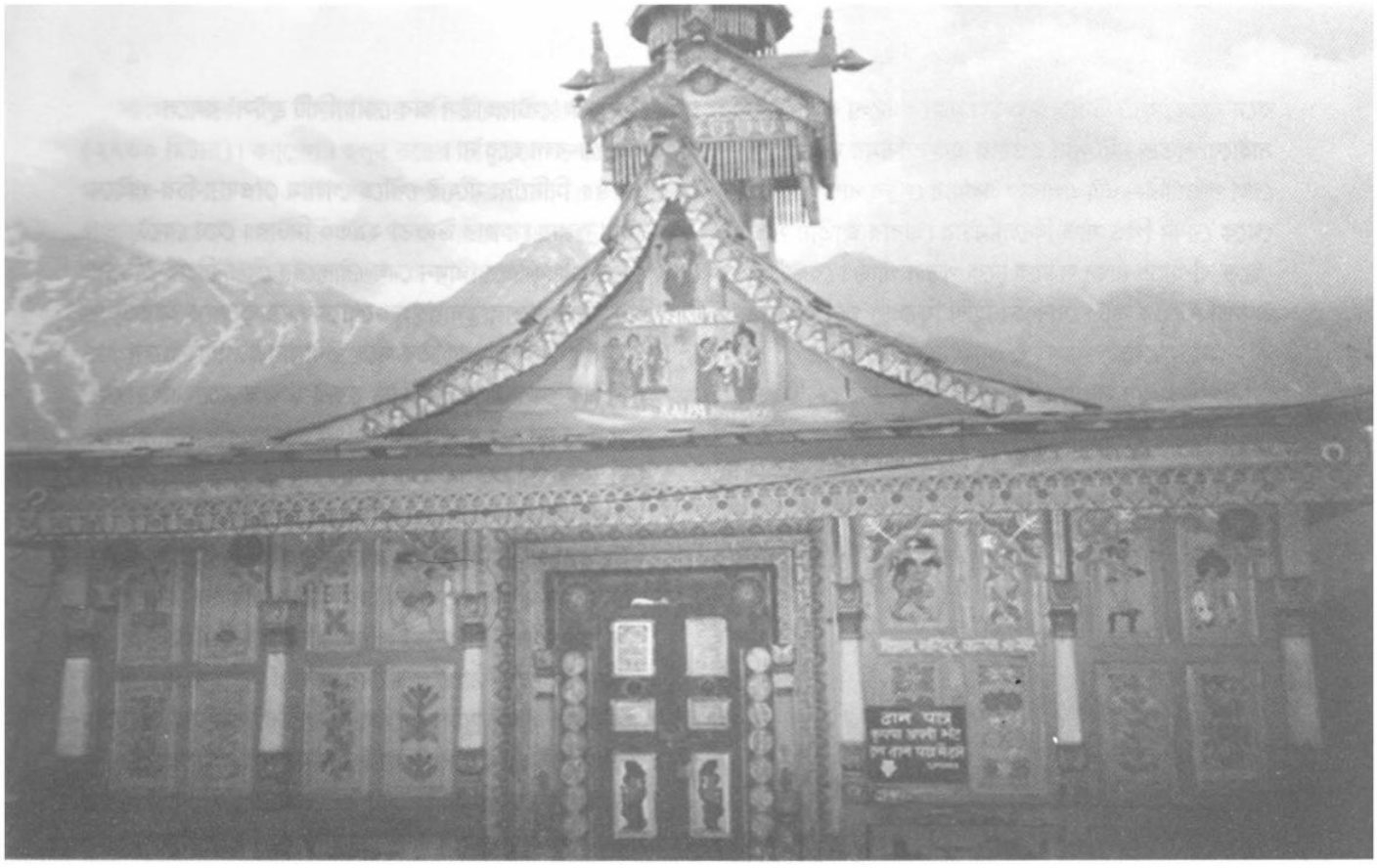

কল্পায় বিষ্ণুমন্দির

লাল, কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও-বা হলদে আলো ঝলমল করে। পাথরটা একদম খাড়া ও মসৃণ, গায়ে বরফও জমে না। আগস্ট মাসে হিমাচলবাসীরা দল-বেঁধে এই শিবলিঙ্গে পুজো দিতে আসেন। এই দীর্ঘ পথটা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। ১৬ থেকে ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় হাঁটাপথের সঙ্গী গ্লেসিয়াল ক্রেভাস, ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচের তাপমাত্রা এবং আরও অনেক বাধাবিঘ্ন। এই পরিক্রমার অবশ্য অনেকগুলো রুট রয়েছে। তবে প্রধান পথটা হল কল্পা থাঙ্গি লাম্বার চারাং ছিটকুল রকছাম সাংলা করছাম হয়ে কল্পায় প্রত্যাবর্তন।'

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অন্ধকার নামছে কল্পায়। আকাশে এখনও লালচে ছোপ। বাতাস আরও ঠাণ্ডা, ধারালো। আমরা হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

প্র য়ো জ নী য় ত থ্য

(১) কিন্নরভ্রমণের শুরু সিমলা থেকেই ভালো। রামপুর সারাহান সাংলা ছিটকুল রেকং পিও আর কল্পা দেখে, আবার সিমলা দিয়ে ফেরা। অথবা জলোরি পাস দিয়ে মানালি চলে যাওয়া। অবশ্য কল্পা থেকে নাকো হয়ে সিপতি উপত্যকাতেও পাড়ি দেওয়া যায়।

(২) কিন্নরে বাসের যাতায়াত অনিয়মিত এবং সময়সাপেক্ষ। সিমলা থেকে ৫-৬ দিনের জন্য গাড়ি ভাড়া করে নিলে, কিন্নরে নিজের ইচ্ছেমতো ঘোরা যায়।

(৩) কল্পায় হিমাচল পর্যটনের হোটেল কিন্নর-কৈলাশ থাকলেও, সাংলা বা ছিটকুল বা রেকং পিও-তে নেই। সাংলায় প্রাইভেট হোটেলের মধ্যে রয়েছে সাংলা গেস্টহাউস, বসপা লজ, ট্রেকার্স লজ, বানজারা ক্যাম্প, মাউন্ট কৈলাশ গেস্টহাউস, হোটেল মোনাল রিজেন্সি।

কল্পায় প্রাইভেট হোটেলের মধ্যে শিবালিক গেস্টহাউস, ব্লু লোটাস হোটেল, কিন্নর ভিলা।

রেকং পিওতে ফেয়ারি ল্যান্ড হোটেল, স্নো-ভিউ।

ছিটকুলে উচ্চমূল্যে টিম্বার লাইন ক্যাম্প, অথবা স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাড়ি।

(৪) বেড়ানোর সেরা সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। এছাড়া এপ্রিল থেকে জুন।

(৫) পাওখারির পর পেট্রল পাম্প কেলং-এর টান্ডি।

আলোকচিত্র : আশিসকুমার ঘোষ

Dabur

Celebrate Life!

Celebrate the goodness of nature.
Celebrate a new spirit.
Celebrate a new beginning.

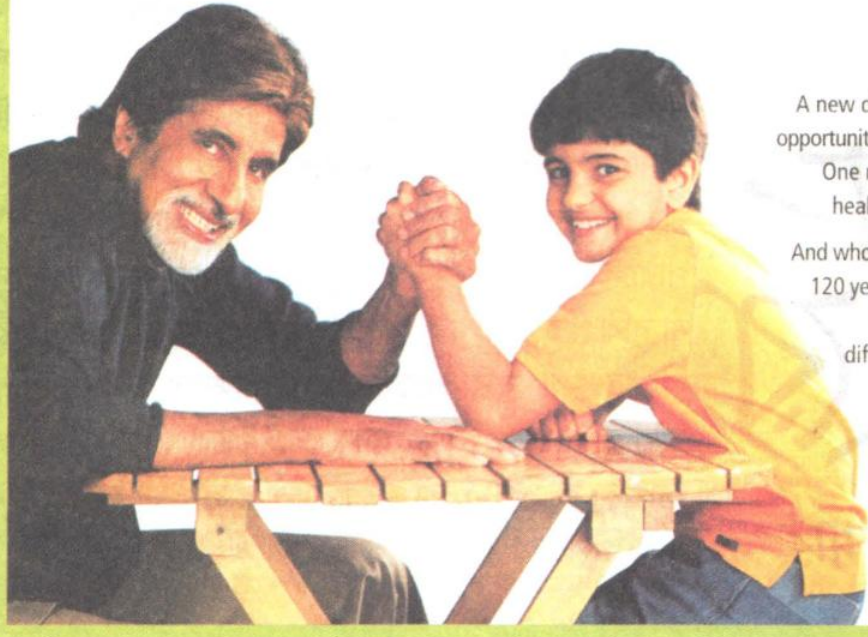

A new day, a new challenge, a new opportunity and living life to the fullest. One needs to be prepared. To be healthy both in mind and body.

And who knows it better than us. For 120 years Dabur has been bringing the goodness of nature in different forms to help you be healthy and stay ahead.

With these wishes we, at Dabur, now come to you in a new form to help celebrate health. Celebrate life.

বই চেনা

যশোধরা রায়চৌধুরী

লীলুদিদির টাইম মেশিন!

লীলা মজুমদার

দিন-দুপুরে। লীলা মজুমদার। সিগনেট প্রেস

কেরোসিন! কেরোসিন!
কেরোসিনের সুবাতাসে
মহাপ্রাণী খইসে আসে,
খাও, খাও, ভইরে টিন
কেরোসিন! কেরোসিন!

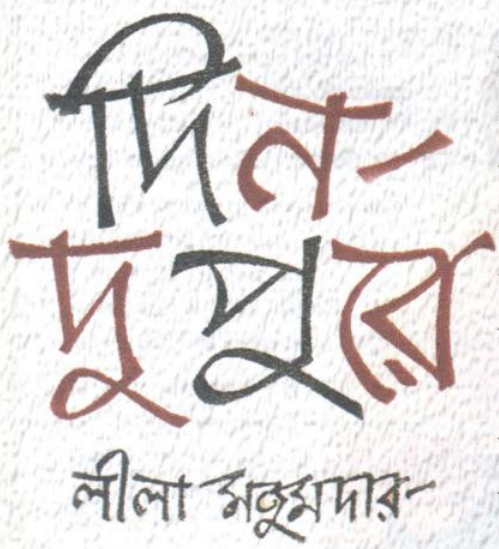

চোখ পাকিয়ে, পায়ের পাতা উল্টে, সটাং হয়ে খাটে বসে, দুই হাঁটুতে হাত বুলিয়ে, মুখে একটা খিদে-খিদে ভাব—এই গানটা কে রোজ রোজ দিন-দুপুরে গায়, সে-কথা কেউ যদি আমাকে বলে দিতে পারো, তবে বুঝব আসল 'সন্দেশী'! পারলে না তো? এটা হল গঙ্গুদার গান। গঙ্গুদা কে? জানো না বুঝি? 'দিন-দুপুরে' পড়োনি? আহা-হা, চুক-চুক, ভারী দুঃখের কথা! যারা পড়োনি, তারা, গঙ্গুদার ভাষায়:
'অনুতাপে দগ্ধ হবি, ড্যাওদুদু চেটে খাবি।'
ড্যাওদুদু কী? ওমা, তাও জানো না? ড্যাওদুদু হল ড্যাওপিঁপড়ের দুধ।

এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য আমাদের শরীরে-যে শুধু দুটো পা আছে, তাই তো নয়। ভূতের রাজার বরের মতো, দুটো করে চোখ আর কানও আছে। কান দিয়ে যেমন গান শুনতে শুনতে চলে যেতে পারো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে—হয়তো এই দেখলে ফকফক করছে রোদ, চাদ্দিকে খটখট করছে ইট-কাঠ-পাথরের শহর, কিন্তু বর্ষার গান শুনতে শুনতে চোখ বুজে চলে গেলে এক ঘন নীল মেঘে-ছাওয়া সবুজ গ্রামের প্রান্তরে! তেমনি চোখ দিয়েও-যে কত কিছু করতে পারো! ছবি দেখতে দেখতে সটাং ঢুকে পড়তে পারো ছবির দেশটাতেই! আবার ছায়াছবি দেখতে দেখতে ঠিক চলে যেতে পারো সেই ছায়াবাজির ভেতরটায়!

সবচেয়ে ভালো বোধহয় চোখ দিয়ে বই পড়াটাই। বই এমন একটা দরজা, যা দিয়ে টুপ করে ঢুকে পড়া যায় সম্পূর্ণ অন্য একটা জগতে—তা সে-জগৎ আর-একজন মানুষের মাথার ভেতরটাই হোক, আর স্বপ্ন বা কল্পনার ভুতুড়ে-অদ্ভুতুড়ে জগৎই হোক। বই পড়ে তো শুধু মাইল মাইল দূরেই চলে যাওয়া যায় না, হাজার হাজার বছর অতীতেও যাওয়া যায়। বই হল কাগজ আর আঠা আর কালি আর ছাপার অক্ষর দিয়ে তৈরি টাইম মেশিন! তোমাকে কোথায় কীভাবে যে নিয়ে যায়, কে বলতে পারে!

যেমন ধরো, সেদিন দুপুরে 'দিন-দুপুরে' টা পুরনো বইয়ের আলমারি থেকে নামিয়ে বসে পড়তে শুরু করেই আমি চলে গেলাম—অন্তত ৩০ বছর আগে—আমার ছোটবেলায়! আবার আমার মা ও-বইটা পড়তেই পৌঁছে গেলেন তাঁর ছোটবেলায়! সত্যি সত্যিই প্রায় ৫৮ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে বইটা বেরোয়, আজ অব্দি বাংলাভাষার সেরা প্রকাশক—একেবারে এক নম্বর—দিলীপকুমার গুপ্ত মশাইয়ের সিগনেট প্রেস থেকে। লেখকের নাম লীলা মজুমদার, আর ছবিগুলো এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। এই দুই নামের সঙ্গে 'সন্দেশী'দের পরিচয় করানোর দরকার নেই। লীলা মজুমদার, আমাদের লীলুদিদি যে স্বয়ং সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন এবং সাক্ষাত-চ্যালা—সেটা জানা থাকলে আর ততটা আশ্চর্য লাগবে না এই ভেবে—লীলুদির এই-যে গল্পগুলো ১৯৩১ সাল থেকে বেরোতে শুরু করেছিল সুবিনয় রায়ের 'সন্দেশ'-এ, সেগুলোই এত্ত মজার আর এত্ত ভালো, সে-সময়ে তাঁর বয়স মোটে ২৩-২৪! শুনতে পাই, সত্যজিৎ রায় তাঁর লীলুপিসির কাছ থেকে 'সন্দেশ'-এ বেরনো এইসব গল্প চেয়ে নিয়ে আসেন, তারপর নিজের হাতে সাজিয়ে, মারাত্মক সব ছবি এঁকে, অসামান্য চৌখুপি বরফিকাটা দু'-রঙা মলাট এঁকে, বইটা বের করার ব্যবস্থা করেন। এই বইটা বেরোবার পর-পরই লীলুদিকে নিয়ে চারদিকে তুমুল হইহই শুরু হয়ে যায়! এমনকী পরশুরাম

মাস্টারমশাই একটা পান তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন, একটা বইয়ের মতন দেখতে টিনের কৌটোতে ভরলেন। কলু তাক করে রইলো। প্রথমটা কিছু মনে হলো না—তারপর ভালো করে দেখলো, মনে হলো মাস্টারমশাইয়ের কপালের দিকটা কিরকম যেন লম্বাটে দেখাচ্ছে, থুতনিটা যেন ঢুকে পড়েছে, চোখ দুটোও কিরকম পিটপিট করতে লাগলো। কলুর বুকের ভিতর কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগলো। মাস্টারমশাই বাড়ি যান না কেন? যদি হঠাৎ ল্যাজ দুলিয়ে হুপ করেন?

মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মন্‌দা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর শেষের দিকে গুটিকতক টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু বাবা সুবিধের কথা নয়। ছেলেগুলো ভাই যায় কোথা?

ওরফে রাজশেখর বসু—বাংলার আর-একজন জাতরসিক লেখক—বইটার দারুণ প্রশংসাও করেন ছাপার অক্ষরে : 'ছেলেমানুষ আর বুড়োমানুষ একই জগতে বাস করে, কিন্তু দুজনের দৃষ্টি সমান নয়। আমরা ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে যে অদ্ভুতলোকের সংস্পর্শে আসি, বড়ো হলে তা ভুলে যাই। দৈবক্রমে কেউ কেউ বড়ো হয়েও বাল্যের দিব্যদৃষ্টি বজায় রাখেন, এঁরাই সার্থক শিশুসাহিত্য লিখতে পারেন। 'দিন-দুপুর'-এর লেখিকা লীলা মজুমদারের এই দুর্লভ বাল্যদৃষ্টি আছে। মাস্টারমহাশয়ের ম্যাজিকে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা একটি একটি করে কমে যায় এবং তাঁর ছাগলের সংখ্যা একটি একটি করে বাড়ে—এই আশ্চর্য তথ্য বার করা যার-তার কর্ম নয়। ছোট ছেলেমেয়েরা এঁর লেখা পড়ে তৃপ্ত হবে, কারণ ইনি তাদের চোখেই দেখেছেন, তাদের ভাষাতেই লিখেছেন, কথাচ্ছলে সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেননি। এঁর বর্ণনার ভঙ্গী মামুলি শিশুসাহিত্যের মতন মোটেই নয়, পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের রচনা।'

আহা, ১৩৩ পৃষ্ঠায় ১৫টা গল্প নিয়ে, আর কী সাংঘাতিক সাংঘাতিক ৬৪টা ছবি নিয়ে এই বই! আমাদের বাড়ির বইটা আমার দিদিকে যখন জন্মদিনে উপহার দেন ঠাকুমা, সেই ১৯৬৭ সালে, সেটা তিনবারের বার ছাপা বই—যাকে বলে তৃতীয় সংস্করণ—দাম তিন টাকা। গল্পগুলোর নামও কেমন মোক্ষম! আর তারমধ্যে ঠাসা আছে যে মশলা, তার একটু স্বাদ পেলেই তোমরা বুঝবে—তিনটে কেন, তিন-দশে তিরিশটা সংস্করণ হলেও, এ-বই কোনওকালে পুরনো হবার নয়! যেমন ধরো, বলো দেখি, কে সেই ছেলে, যে গায়ে নীল ডোরাকাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফপ্যান্ট পরে, তেল-চুকচুকে আহ্লাদে আহ্লাদে বোকার মতন ভাব করে, লম্বা চুলগুলো সব নোটানোটা কানের ওপর ঝুলিয়ে, প্রথমদিন মাস্টারমশায়ের পিছন পিছন ক্লাশে ঢোকে? সে হল 'নতুন ছেলে নটবর'।

কিম্বা, তোমরা কি জানতে, ঘোতনের ভালোনাম প্রশান্তকুমার, আর সে সকালবেলা উঠেই কী করে? শোনো তবে : 'গায়ের চাদরটা এক লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারই উপর দাঁড়ালাম। চটি খুঁজে পেলাম না। খালি পায়ে স্নানের ঘরে গেলাম। দাঁত মাজলাম না, তাতে যে সময়টুকু বাঁচলো, সে সময়টা কলের মুখ টিপে ধরে পিচকিরির মতন দেয়ালে-টেয়ালে জল ছিটোলাম। খানিকটা আবার বাবার তোয়ালের উপরও পড়লো দেখলাম। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে, মুখহাত মুছে, সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে মারলাম। তারপর

একমুখ জল ভরে নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে নিচে রাস্তায় একজন বুড়ো লোকের গায়ে পু—চ্ করে ফেলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চুলটাকে খুব যত্ন করে আঁচড়াতে লাগলাম।' এই গল্পটার নাম 'ঘোতন কোথায়?' কিম্বা ধরো, 'টাকা চুরির খেলা' গল্পটা থেকেই আমি প্রথম জানতে পারি—বোর্ডিং জায়গাটা কেমন, আর সেখানে সকালবেলা হালুয়া খেতে বিশ্রী হলে কী হবে, 'ওতে খুব ভালো ঘুড়ি জুড়বার আঠা হয়।'

আমার কাছে যে 'দিন-দুপুরে'টা আছে, পাতাগুলো জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে গেছে। ধরো, আমরা এই বইতে তো আলুকাবলি বা কাসুন্দি দিয়ে আমমাখাও ফেলেছি, কোনাগুলো ধরে টেনেছি, পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়েছি। কাড়াকাড়ি করতে করতে মলাটও এক-আধবার খুলে এসেছে, সেলোটেপ দিয়ে আটকেছি। ধরো, আমাকে জিয়োগ্রাফি বই খুলে মা 'ভারতের লৌহশিল্প' পড়তে বলে রান্নাঘরে গেলেন। আমিও উঁ-উঁ করে মুখস্ত করতে বসে গেলাম। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানল না জিয়োগ্রাফি বইয়ের তলায় 'দিন-দুপুরে' খোলা! যদিও একটু পরেই দিদি এসে কাঁইমাঁই করে বলল—ওর পড়ার টেবিল থেকে বইকে-বই গায়েব হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কী বই, সেটা খোলসা করে বলল না। কিম্বা ধরো, গরমের ছুটির দুপুরবেলা দিদুর বাড়িতে। মা, মামি, দিদু সবাই ঘুমোচ্ছেন, মাথার ওপর পুরনো পাখা গ্যাঁও-গ্যাঁও করে ঘুরে চলেছে, জষ্টিমাসের ফুটিফাটা গরম। তখন আমি চলে গেছি বাড়ির সবচেয়ে কোনার, সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সবচেয়ে অন্ধকার ঘরে। খড়খড়িওলা সবুজ কাঠের জানলাগুলো এঁটে, আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ছি 'সিঁড়ির মোড়ে বিপদ' গল্পটা। আর লোম খাড়া-খাড়া হয়ে যাচ্ছে! ধরো, খানিক বাদেই রন্টুদা আর মিন্টিদি এসে বইটা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নিল। বিকেলের মধ্যেই দু'জনে গোগ্রাসে পড়ে ফেলল। সন্ধেবেলা বই হাতবদল হয়ে চলে গেল পুঁটিদির কাছে। তারপর দিদি, তারপর বাচ্চুদা, তার থেকে বাপিদা। রাত্তিরে গোল হয়ে বসে আমরা 'দিন-দুপুরে' কুইজ খেলি:

(ক) বদ্যিনাথের আশ্চর্য বড়ি গুঁজে-দেওয়া পানটা মুখে পুরে দিতেই যে মাস্টারমশাইয়ের মুখটা কেমন-যেন বাঁদুরে-বাঁদুরে হয়ে গেল, তাঁর বিখ্যাত সুবোধবালক ছেলের নাম কী?

(খ) 'সর্বনেশে মাদুলি' গল্পটাতে ওই-যে মাদুলিটা ডানহাতে বেঁধে ইশকুলে এসেছিল গুপে, সেটা তার আগে ওর দাদামশায়ের হাতে কতদিন বাঁধা ছিল বলেছে গুপে, যে-জন্যে ওর দাদামশায়ের হাতে সাদা দাগ তো পড়ে গেছিলই, এমনকী মাঝে মাঝে মাদুলিটার ওপরেও নাকি চুলকোতেন?

(গ) 'নতুন ছেলে নটবর' আসলে ইশকুলের কার যেন কী হত?

সে লোকটা আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বললো: 'কি জন্য কলকাতায় পড়ে থাকো আর ইস্কুলে যাও? জানো, রবি ঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন! আর জানো, সাঁওতাল পরগণায় যখন মহুয়া গাছের ফল পাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। আর বনের ভাল্লুকগুলো মহুয়া খেয়ে খেয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐরকমভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে?' আমার তখন মনে হলো দিনের পর দিন ইস্কুলে গিয়ে আমি বৃথাই জীবন নষ্ট করছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনও ইস্কুলেই যায়নি।

নিমগাছতলায় ভূত আছে।
একদিন ভোরবেলায়,
মই বগলে ছাগলদাড়ি লোকটা
রাস্তার আলো নিবিয়ে নিবিয়ে
চলে গেলে পর, নেড়ু
দেখেছিলো কোমরে রুপোর
ঘুনসিওয়ালা, মাথায় গুটিকতক
কোঁকড়া চুল, ভূতদের
ছোট কালো ছেলে নিমগাছতলায়
কাঁসার বাটিতে নিমফুল
কুড়চ্ছে। নেড়ুকে
দেখেই ছেলেটা এক চোখ
বুজে বগ দেখালো।
নেড়ু ভাবলো ভূত কিনা তাই
ভদ্রলোক নয়।

(ঘ) 'মহালয়ার উপহার'-এ মহালয়ার রাত্তিরে চুরি করতে বেরিয়ে পায়রার ডিমের মতো বড় বড় মণিমুক্তোর বদলে শিবু কী পেয়েছিল?

(ঙ) 'আচার' গল্পের ঘোতন পিসিমার আচারের ঘরে ঢুকে আমতেল ভেবে কী তুলেছিল?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর তখন সবাই একবাক্যে জানতাম : বিধুশেখর, একচল্লিশ বছর এক মাস, হেডমাস্টারের ভাইপো, আট সেরি কাতলা মাছ, আরশুলা চ্যাপ্টা।

আমাদের গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটিগুলোয় মাসতুতো, মামাতো আর পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে হুটোপুটি আর বেদম হইচইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে এই বইটার গপ্‌পোগুলো। যেমন, দিদুর বাড়ির চৌবাচ্চায় নেমে পড়ে বাচ্চুদা ও বাপিদার সারা বাড়ির রান্নার জল নষ্ট করা, বা ছাতে কুমিরডাঙা খেলতে খেলতে শ্যাওলায় পা পিছলে আলুর দম হয়ে পুঁটিদির চশমা-ভাঙা, বা ক্যারাটের শট দেখাতে গিয়ে রন্টুদার এক লাথিতে আমার হাতে-ধরা ঘুগনির বাটি উল্টে আমার মুখে-মাথায় ঘুগনি মাখামাখি আর অমনি ছোটমামা এসে কিচ্ছু না-শুনেবুঝেই সামনে বাচ্চুদাকে পেয়ে দুটো চড় কষিয়ে চলে যাওয়া—এ-সবের সঙ্গে 'দিন-দুপুরে'র পানুদা, গুপে আর গণশা মিশে লটরপটর হয়ে আছে। কে বলবে যে, আমার জন্মের গোটা তিরিশেক বছর আগে গল্পগুলো লেখা হয়েছিল 'সন্দেশ'-এ? কে বলবে যে, গল্পগুলো যাঁর লেখা, তাঁর বয়স এখন ৯৮ পেরিয়ে ৯৯? কী জানো, বড়-লেখকদের বয়স বাড়ে না! আশ্চর্য কৌটোর ভেতরে ভরা থাকে তাঁদের প্রাণভোমরা, তার বয়সের আর-কোনও নড়চড় নেই! আর বয়স বাড়ে না সেরা বইয়ের! পাতা ছিঁড়ে যায়, বাঁধাই নষ্ট হয়, তবু!

লীলুদির এইসব গল্পে শুধু-যে আমাদের কথাই পেতাম, তাই নয়। গা-শিরশির-করা ভূতেদের কথাও আছে! আর সে-সব ভূত মোটেই কারও ক্ষতি করে না। তাদের পা-গুলো সব উল্টো বাগে। কিন্তু হলে কী হবে, তারা বগ-দেখানো আর অমাবস্যার রাতে সাদা কাপড় পরে এক-আধটু ভয়-দেখানো ছাড়া বিশেষ কিছু করে না! 'গুপের গুপ্তধন' বা 'ভূতের ছানা' পড়লেই সেটা মালুম পাবে। তেমনি আছে চোরেরাও! লীলুদিদির চোরেরা সাহসী এবং বুদ্ধিমান। বড্ড ভালোমানুষ। শিবু তো সত্যি সত্যি পাকা চোর। তবে রেলগাড়ির ছিঁচকে চোরটি যা বেদম ঠকা ঠকেছিল, তা জানতে 'হুঁশিয়ার' গল্পের মধ্যে ঢুকতেই হবে।

আমার তো মনে হয় আমাদের জীবনে যত-সব উদ্ভট্টি কাণ্ড ঘটেছে, সে-সব লীলুদিদির কৃপাতেই ঘটেছে! যেমন ধরো, আমার দিদি-যে

ফুচকা খেতে গিয়ে ওয়ার্ক এডুকেশনের সেলাইয়ের ব্যাগটা ইশকুলের পাঁচিলের ওপর রেখে বেমালুম ভুলেই গেল, আর বাড়ি এসে মায়ের কাছে যে রামবকুনিটা খেল, সেটার সঙ্গে তো খুব মিল পানুদা বলে সেই পাকা ছেলেটার—কুস্তির প্যাঁচ দেখাতে গিয়ে স্লিপ করে কাচের আলমারির দরজা ভেঙে ফেলে হেডমাস্টারের কাছে বকুনি খাওয়ার, যেটাতে পানুদা চমকে গিয়ে নিজের আলজিভটিভ গিলে একটা বিষম কাণ্ড হয়েছিল!

কী করে যে লীলুদিদি সব আমাদের কথাগুলোই বইটার পাতায় পাতায় এভাবে লিখে রেখেছেন, কে জানে! যেমন ধরা যাক, দিদি আর আমি যে কোনওদিন দুধের তলানি, পাঁউরুটির কোনা আর উচ্ছেভাজা খেতাম না, আর সজনেডাঁটাগুলো রণ্টুদা কীভাবে যেন থালার পাশে লুকিয়ে ফেলে রাখত, এটা কিন্তু পুরো ঘোতন-মার্কা! সে বলেছে, 'ভাত কতক খেলাম, কতক চারপাশে ছড়ালাম, কতক পুসিকে দিলাম, আর কতক পাতে পড়ে রইলো। মাছটা খেলাম, ডাল খেলাম, আর ঝিঙে, বেগুন ইত্যাদি রাবিশগুলো সব ফেলে দিলাম।' গণশার যে-বিপদটা হয়েছিল, সেটা অবিশ্যি আমাদের কক্ষনও হয়নি। মাস্টারমশাইয়ের ইশকুলে দিনে দিনে ছেলে কমছে আর ছাগল বাড়ছে দেখে ওকে কিনা ব্যা-ব্যা ডাকা আর দুব্বো ঘাস চিবিয়ে দেখতে হয়েছিল! ঘাসে আবার ছোট্ট একটা শুঁয়োপোকা ছিল।

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাস্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো! বোকার মতন মুখ করে থাকলে সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। পড়তো ওর ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো, তবে দেখা যেতো!... নগা বললে, 'ব্যাটা খোশামুদে!' ছেলেটা শুনে বললে, 'ছিঃ, হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে।'

এমন সব পিলে-চমকানো, হিরের টুকরো গল্প এখন ছড়িয়ে আছে লীলা মজুমদারের নানান বইতে। কিন্তু 'দিন-দুপুরে' আর পাওয়া যায় না—এ বড় সুখের কথা নয়! এই সবক'টা গল্প (বানানগুলো শুধু আধুনিক করে দিয়ে), সব ছবি আর এই মলাট নিয়ে হুবহু 'দিন-দুপুরে' বইটা নতুন শতকের নতুন ছেলেমেয়েদের কাছে এক্ষুনি পৌঁছনো দরকার। যদি সিগনেট প্রেস না-করে, আর-কোনও সেরা প্রকাশক এই মহান দায়িত্বটা পালন করুক।

আজকে অনেকদিনের পুরনো, তাপ্পিদেওয়া, সেলোটেপ আটকানো, আলুকাবলির দাগ-লাগা আমাদের বাড়ির 'দিন-দুপুরে'টা নামাতেই, পুরো ছোটবেলাটা হু-হু করে মনে পড়ে গেল! তাই সব তোমাদের জন্যে লিখে দিলাম।

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম

লীলা মজুমদার ৯৯-এর নকশা : সমীর সরকার

'দিন-দুপুরে'র নামাঙ্কন ও ছবি : সত্যজিৎ রায়

ক'দিন আগে দারুণ একটা উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলুম। দিল্লিতে একটা সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হলো, তার নাম টি এল এম সালাম!

টি এল এম মানে 'দ্য লিটল ম্যাগাজিন'—এটা একটা পত্রিকার নাম। মস্ত বড় পত্রিকা, মোটেই লিটল নয়। ইংরিজিতে বের হয়। দক্ষিণ এশিয়ার সব ভাষার সাহিত্য ইংরিজিতে অনুবাদ করে এঁরা ছাপেন। আমরা যাতে কলকাতায় বসেই শ্রীলঙ্কায়, নেপালে, ভূটানে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে—কোথায় কী লেখা হচ্ছে, তার একটা ধারণা পাই। এমনিতে তো যে-যার মাতৃভাষায় লিখি, অন্য ভাষার মানুষরা কিছুই টের পান না কোথায় কে কী লিখছে! 'দ্য লিটল ম্যাগাজিন'-এর পাতায় একটা মোটামুটি ছবি পাই অন্যান্য দেশের আধুনিক লেখালেখির।

এই পত্রিকার বয়স মাত্র ছ'-বছর। ওরা এবারে কী কাণ্ড করেছে বলো তো? তিনটে পুরস্কার দিয়েছে—দক্ষিণ এশিয়ার সব ভাষার লেখকদের মধ্যে যাঁদের লেখা সবচেয়ে ভালো লাগে, এরকম তিনজন বড় বড় লেখককে। কবিতায় একজনকে, গল্প-উপন্যাসে একজনকে, আর নাটক ও অন্যান্য রচনাতে একজনকে।

প্রথম বছরের কবিতার পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তাঁর কবিতা—যে-ছেলেরা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধে লড়ছিল—তাঁদের খুব মনের জোর জোগাতো। কবি শামসুর রাহমান থাকেন ঢাকাতে।

নাটকের জন্য পুরস্কার পেলেন বিজয় তেন্ডুলকর (না, সচিন নয়, বিজয়। এঁর জন্ম ১৯২৮-এ।)। বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক অনেকদিন ধরে ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, অভিনীতও হচ্ছে। তোমরাও নাম শুনেছ হয়তো। 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', 'কমলা', 'চোপ, আদালত চলছে!'—এ-সব নাটকই ওঁর লেখা। উনি সিনেমার গল্পও লিখেছেন। শ্যাম বেনেগাল-এর 'মন্থন', গোবিন্দ নিহালনীর 'আক্রোশ', 'অর্ধসত্য'—এ-সব ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য ওঁর। উনি লেখেন মারাঠিভাষায়, থাকেন মুম্বাইতে।

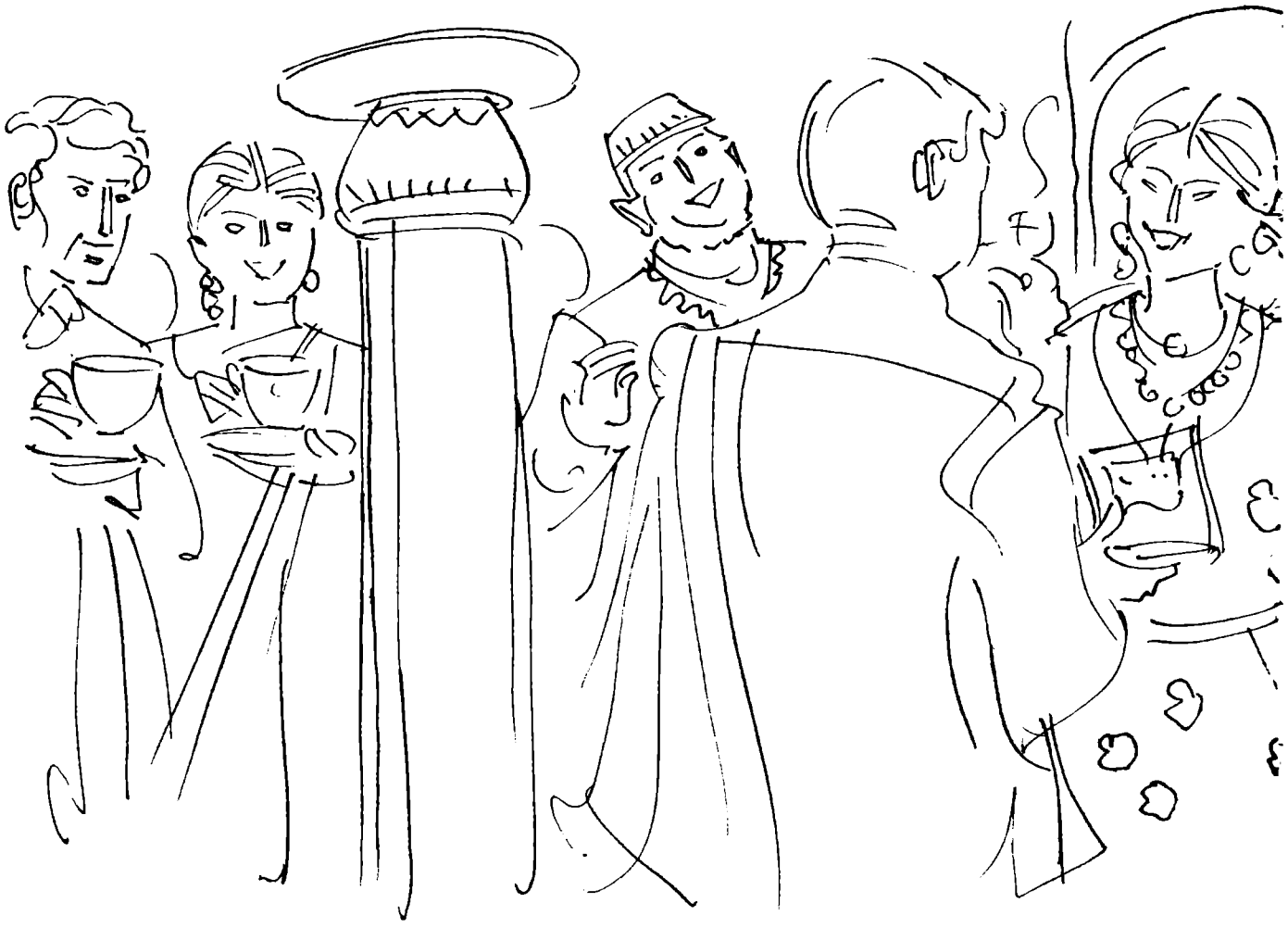

নবনীতা দেব সেন

হিং টিং ছট

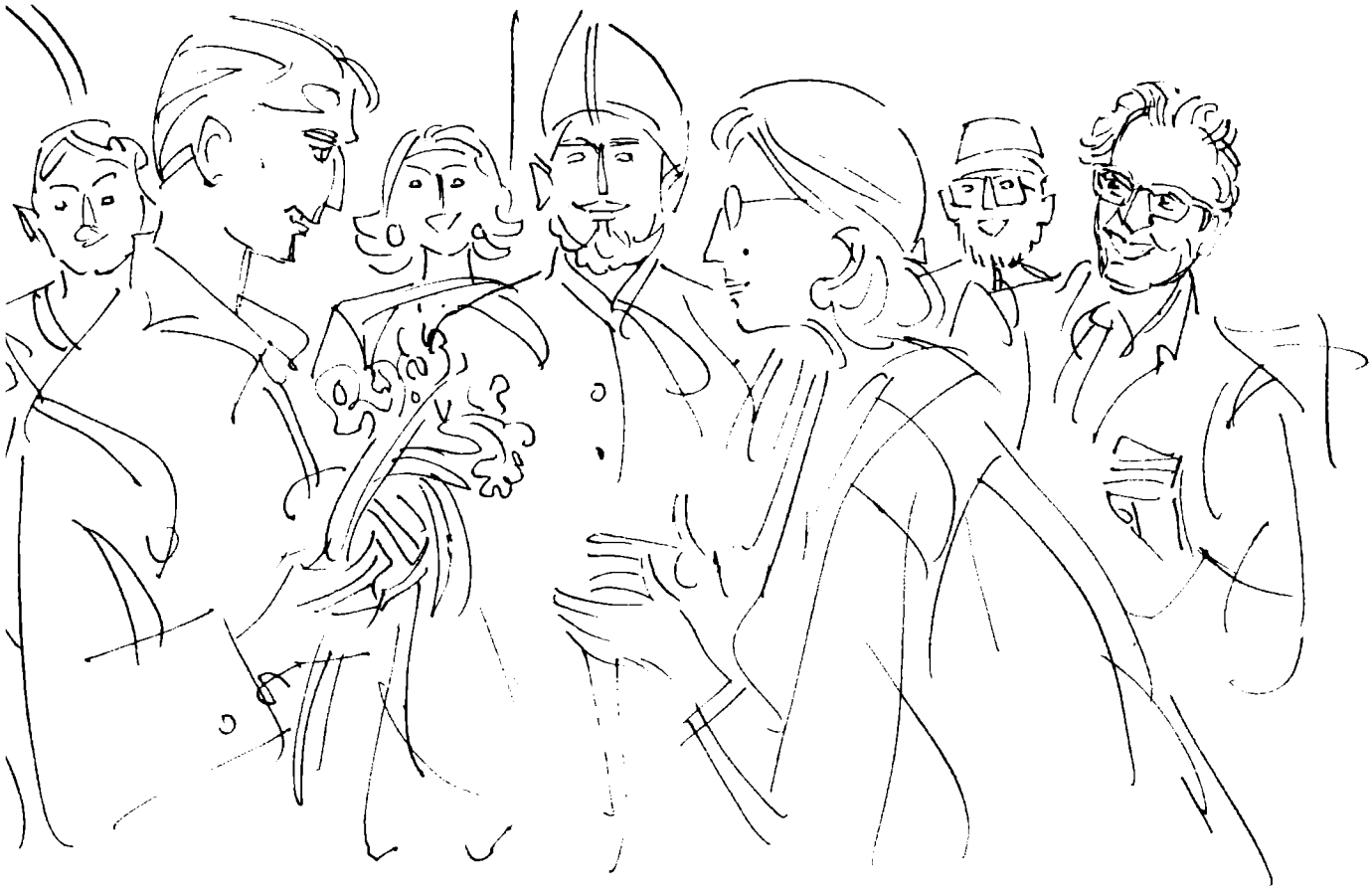

আর গল্প-উপন্যাসের জন্য পুরস্কার পেলেন যিনি, তাঁর আবার দুটো নাম। কমলা দাস নামে তিনি ইংরিজি ভাষায় কবিতা লেখেন, আর মাধবী কুট্টি নামে লেখেন গল্প-উপন্যাস মলয়ালমভাষাতে। দুটোতেই তাঁর খুব সুনাম, দু'টি ভাষাতেই তাঁর রচনা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তিনি বাস করেন কেরালায়, কোচিনের কাছে। মাধবী কুট্টি নামে মলয়ালমে লেখা গল্প-উপন্যাসের জন্য টি এল এম সালাম পুরস্কার পেলেন।

এই 'সালাম' (এস এ এল এ এম) কথাটার মানে কী বলো তো? হ্যাঁ, সেলাম তো বটেই! টি এল এম (অর্থাৎ, 'দ্য লিটল ম্যাগাজিন') পত্রিকা এঁদের সেলাম জানাচ্ছে, এঁরা এতদিন ধরে এত ভালো লিখছেন বলে। কিন্তু 'সালাম' কথাটার আর-একটা মানে আছে। 'এস' হচ্ছে সাউথ, 'এ' এশিয়ান, 'এল' মানে লিটারেরি, 'এ' অ্যাওয়ার্ড, আর 'এম' হচ্ছে মাস্টার্স। 'শ্রেষ্ঠদের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য পুরস্কার' বা 'সাউথ এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য মাস্টার্স'—এই হচ্ছে 'সালাম'-এর গোপন বৃত্তান্ত!

'দক্ষিণ এশিয়া' বলে কোনও জায়গা আছে নাকি? আছে বৈকি, ঠিক 'দক্ষিণ ভারত' যেমন আছে। তেমনি করে দক্ষিণ এশিয়াও আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটা দেশকে জড়িয়ে এই দক্ষিণ এশিয়া। ওই-যে, সার্ক কান্ট্রিজ বলে না? এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সেই দেশগুলোই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান আর মরিশাস—এই সপ্তরাষ্ট্র সমন্বয়।

আমি ছোটবেলায় বই বা খাতায় নাম-ঠিকানা যেমন লিখতুম, পরে দেখেছি অমিত চৌধুরীও তাঁর 'এ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস' বইতে অবিকল আমার কথাটাই লিখেছেন!

কুমারী নবনীতা দেব
'ভালো-বাসা'
৭২ হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ
কলিকাতা
পশ্চিমবঙ্গ
ভারতবর্ষ
এশিয়া

সাতটা ধাপে নয়, আটটা ধাপ! এশিয়াতেই থেমে যেতুম। তারপর 'পৃথিবী' লিখিনি কখনও। কিন্তু ইচ্ছে করলেই লেখা যেতো: 'পৃথিবী'। তার নীচে: 'সৌরমণ্ডল'।

আমাদের ঠিকানা কি সোজা? কত বিশাল একটা বাসস্থল না আমাদের!

এইবার আমি কিন্তু অন্যভাবে লিখব। 'ভারত'-এর পরে যাবে 'দক্ষিণ এশিয়া', তারপর লিখব 'এশিয়া'।

'দক্ষিণ এশিয়া' বলে দিব্যি কী সুন্দর একটা সাহিত্যের ঠিকানা তৈরি হয়ে গেল। এ-অঞ্চলের সব ভাষায় ভাষায় গলাগলি। ভারতেও উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধিভাষায় কথা বলে মানুষ, পাকিস্তানেও তাই। বাংলাদেশেও বাংলা বলে, ভারতেও। ভারতেও তামিল বলে, শ্রীলঙ্কাতেও তিনটে ভাষার মধ্যে তামিল একটা। আর সবখানেই তো ইংরিজি আছে, সাহেবদের রেখে-যাওয়া উপহার হয়ে।

টি এল এম-এর পুরস্কার প্রধানত সেইসব সাহিত্যিকদের জন্যে, যাঁরা মাতৃভাষায় লেখেন। কিন্তু ইংরিজিই যাঁদের মাতৃভাষার মতো, তাঁরাও বাদ পড়েননি।

বাদ দেওয়া নয়, জড়িয়ে নেওয়াই তো আবহমান ভারতবর্ষের শিক্ষা।

এই পুরস্কার দেওয়ার দিনে আমি ছিলাম তো—কী সুন্দর করে শামসুর রাহমানের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন বাঙালি নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেন। কমলা দাস ওরফে মাধবী কুট্টির হাতে পুরস্কার তুলে দেন গুলজার—মুম্বাইয়ের ফিল্ম জগতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। আর বিজয় তেন্ডুলকরকে প্রাইজ দিলেন থিয়েটার ও সিনেমার বিখ্যাত মানুষ গিরিশ কারনাড স্বয়ং।

তারপরে হলো নতুন লেখার জন্য পুরস্কার—টি এল এম নিউ রাইটিং অ্যাওয়ার্ড। এই পুরস্কার পেলেন পুনের এক গল্প-লিখিয়ে যুবক, নাম জয়ন্ত সাংকৃত্যায়ণ। সে জাজ-ব্যান্ডে বাজায়, আর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে। তার গল্পটাকে একবাক্যে তিনজন বিচারকই প্রথম বলে বেছেছেন (গল্পে কিন্তু কোনও লেখকের নাম ছিল না)!

আমি পরে জানতে পারলুম যে, এই ছেলেটা—জয়ন্ত—পণ্ডিত ও দার্শনিক রাহুল সাংকৃত্যায়ণের ছেলে। গুণী ছেলে।

নামাঙ্কন: দেবাশিস দেব। অলঙ্করণ: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

এই ই-মেল আর এস এম এস-এর যুগেও কাগজে কলম দিয়ে
চিঠি লেখার মতো সুখ আর হয় না!

মাসে মাসে সেরা বন্ধুর ঠিকানা!
মনের মতো বন্ধু খুঁজে, অফুরন্ত ভাব জমানো!

সোমদত্তা চট্টোপাধ্যায়। ১১ বছর
পঞ্চম শ্রেণী। মধ্যমগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়
শখ: কুইজ, অঙ্কের খেলা ও ধাঁধাচর্চা,
প্রকৃতিপ্রেম, গান গাওয়া।
নজরুল ইসলাম সরণি
পূর্ব উদয়রাজপুর। মধ্যমগ্রাম। উত্তর ২৪ পরগণা

তিতাস মল্লিক। ১০ বছর
পঞ্চম শ্রেণী। কোন্নগর শান্তিলতা শিক্ষায়তন
শখ: ছবি-আঁকা, ক্রিকেট খেলা, টিভিতে
কার্টুন-চ্যানেল দেখা, বইপড়া।
সঞ্জনা ভিলা। ফ্ল্যাট জি ১
৫৬ শিবচন্দ্র দেব স্ট্রিট। কোন্নগর
হুগলি। ৭১২২৩৫

ময়ূখ চক্রবর্তী। ৬ বছর
শিশুশ্রেণী। নিউ ইমাকুলেট ইংলিশ স্কুল,
মুর্শিদাবাদ
শখ: বইপড়া, ছবি-আঁকা, ভিডিও-গেম খেলা।
সাহানগর। মুর্শিদাবাদ। ৭৪২১৪৯

অনীক বিশ্বাস। ১৩ বছর
সপ্তম শ্রেণী। পালচৌধুরী উচ্চতর
মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রানাঘাট
শখ: বইপড়া, টিভি দেখা, ক্রিকেট খেলা।
মহাপ্রভুপাড়া। ৫৯ কামারপাড়া লেন
রানাঘাট। নদিয়া। ৭৪১২০১

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

শুরু হল এপিক উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

গাঁয়ের নাম মঙ্গলপুর। লাল মাটি, নীল ঝিল, সবুজ খেত, পানাপুকুর আর বাঁশঝাড়ে গাঁথা। পাশ বেয়ে বয়ে-চলা ঘোলা জলের নদীটির নাম কোকিল, ওই অদূরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে অজয়ে। গাঁয়ের লোক গর্ব করে: 'আমাদের কোকিল বসন্তের কোকিল নয়কো, ই সারা বচ্ছর গায়।'

গাঁয়ের ও—ই দূরে ক'টি টিলাও উঁকিঝুঁকি মারে, খুব বেশি নয়, অল্পেকটু। তার উপরে আকাশ বেশ ফটফটে নীল—সূর্য ডোবার বেলা যখন কাঁচা সোনা আর

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : সমীর সরকার

অবতার

মূল ইংরিজি থেকে রূপান্তর : শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়

সুবিনয় রায়

সত্যজিৎ রায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লীলা মজুমদার

নলিনী দাশ

বিজয়া রায়

এঁরা সবাই সন্দেশ-এর সম্পাদক

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

কমলা রঙ ধরে পশ্চিমে, টিলার পিছনে একটু একটু করে ডুবতে থাকে সূর্য—তখন গ্রামবাসী উদাসচোখে ওইদিকে চেয়ে কী দেখে কে জানে! কেউ কেউ নমো করে সূর্য কিংবা সূর্যাস্তকে। নন্দ পুরোহিত ডুবন্ত সূর্যকে নমো করতে করতে ডাকেন 'রবি ঠাকুর' বলে। বলেন, 'সূর্যাস্তকালে রবি ঠাকুরের মহিমে ধারণ করতেই তো ওই পাহাড়গুলার জন্ম।'

মঙ্গলপুরের আরও অনেকের মতোই কী করে, কী করেই একদিন এখানে এসে পড়েছিলেন নন্দ পুরোহিত। তারপর আর ফিরে যাওয়া হয়নি। গ্রামের একটাই সূর্য, একটাই চন্দ্র, একটাই নদীর মতো একটাই পুরোহিত এখন নন্দ। আর হ্যাঁ, একটাই মন্দিরের মতো—মঙ্গলচণ্ডীর থান। আড়ালে সব্বাই তাঁকে 'নন্দপুরুত' বলে ডাকলেও, সামনে এলে কপালে জোড় হস্ত করে ডাকে 'ভটচায্যিমশাই'। এই ভটচায্যিমশাই-ই একদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসে রায় দিয়েছিলেন : 'এই মঙ্গলচণ্ডীর থান হইতেই গ্রামের নাম একদিন হৈল গিয়া মঙ্গলপুর।'

সামনে-বসা লোকজনের কারওই সেদিন সাহস হয়নি যে জিজ্ঞেস করে, 'তা ভটচায্যিমশাই, এ-গাঁ আগে, না থানের মা আগে?'

সবাই নীরব দেখে নন্দ পুরোহিত একটা কাষ্ঠহাসি দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা কেউ কোনও রা কাড়ো না দেহি! কতাটা কি আমি মিথ্যে কয়েছি?'

সবাই সেই চুপচাপ দেখে নন্দ বললেন, 'তা সহস্র বৎসর তো হবেই। মাটির থিকা আপনা হইতেই উঠলেন পাথরপেতিমা মা।' বলেই কপালে হাত ঠেকালেন পুরোহিত। তখন সন্ধে লগ্ন, বাড়ি বাড়িতে শাঁখ বাজল, মন্দিরে ঘণ্টা দিল কাজের মেয়ে চারুকেশী।

'এই সেরেছে, সন্ধে লেগে গেল!' বলে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে একবার অস্তাচলের রবি ঠাকুরকে, তারপর থানের দেবীর দিকে নমো দিতে দিতে গর্ভগৃহের দিকে পা চালালেন নন্দ।

এইসময় হাবার ঠাক্‌মা ভাঙা বাঁশির মতো সুর তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা বাবা, এত আদ্যিকেলের কতা তুমি কুত্থিকে জানলে গো ঠাকুর?'

দ্রুত চলার মধ্যে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন নন্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ঠাক্‌মাকে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ভাবলেন দু'-দণ্ড, তারপর বেজায় গম্ভীরস্বরে বলে দিলেন, 'ব্যাদে আছে, ঠাক্‌মণি।'

'বেদ'-এ কী আছে, সে আর ক'জন জানতে পারে! তবে জন্ম থেকে গাঁয়ের সব্বাই দেখে আসছে মায়ের মন্দিরকে। গাঁয়ের ক্ষৌরকার দেবেন নাকি বারকয়েক দূরের ওই টিলার শিখরে চড়ে মন্দির দর্শন করেছে। তারমধ্যে একবার পূর্ণিমার রাতে। সে নাকি এক আশ্চর্য শোভা! মন্দিরে রুপোলি আগুন ধরেছে তখন, চাঁদ গলে-গলে রুপো ঝরছে মন্দিরের চুড়োয় আর দূরের কোকিলে।

সে-বর্ণনা শুনতে শুনতে উত্তেজনার বশে হরি দত্ত বলে উঠেছিল, 'তা এক পুন্নিমেয় আমায় ওই শোভা দেখাবিনে, দেবেন?'

দেবেনও তেমনি, নাপিত যখন—কথা বেচে খায়। বললে, 'হরিবাবু, আপনে স্বর্ণকার। ওই শোভাকালে আপনে কি আর থির থাকবেন? লাফে লাফে রূপা কুড়াবেন। তায়ে মায়ের অমাননা হবে।'

টিলার থেকে আরও কেউ কেউ গাঁ-টাকে দেখেছে। বলেছে, 'দেখার কিছু নেই, তবে ভালোই লাগে।'

তা কিছু দেখার না-থাকলে, ভালো লাগে কেন? তখন বলা হয়েছে, 'নিজের গাঁ-কে কার-না ভালো লাগে! আর সব গাঁয়ে কি কোকিল আছে? না টিলা থাকে? না অমন সোন্দর মায়ের থান?'

যারা এ-সব কথা বলে, তারা যে অন্য অনেক গাঁ-গঞ্জ দেখেছে, তাও নয়। সব এখান-ওখান থেকে উড়ে-আসা ধারণা। আর ধারণার উড়ে আসতে পাখা-পাখনা লাগে না। না-হলে ওই শহরের বাবুটি কোত্থেকে পেলে অমন ধারণা যে, ক'দিন বাদে চাঁদে মানুষ নামবে!

চাঁদে মানুষ? সে তো জলে পাথর ভাসার মতন। চাঁদে ওঠার কি রাস্তা আছে?

'রাস্তার কী দরকার?' জোর সওয়াল বংশী কাঠমিস্তিরির, 'হাওয়াই জাহাজ উড়তে দেখিস না? এই আকাশ থিকে ওই আকাশ যায়। কীসে যায়?'

'কীসে যায় গো, বংশী?' বিনুনি দোলতে দোলাতে জিজ্ঞেস করেছিল সাঁওতাল মেয়ে ঝিল্লি।

তখন বিড়িতে শেষ টান দিয়ে, সেটা দূরে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বলেছিল বংশী মিস্তিরি, 'কীসে আবার, কেরাসিনে! যে কেরাসিনের কাঠ দিয়ে রোজ ইস্কুলের টুল বানাচ্ছি।'

রোদে-জলে, গ্রীষ্মে-বর্ষায় নানা রূপ ধরে মঙ্গলপুর। তাতেও অন্য অনেক গ্রামের থেকেও কিছুই আলাদা হয় না সে। গরমে শুকিয়ে আঁট হয়ে যায় জমি, আর জল তলিয়ে কোথায় সিঁটিয়ে যায়! যেই আবার বর্ষা নামল, সেই শুকনো লাল ধুলোই গলেমলে, মাখামাখি হয়ে সারা গাঁ একেবারে কাদায় থিক-থিক! এ-গাঁ, ও-গাঁয়ের লোকের দেখা হলে তখন একটাই জিজ্ঞাস্য সবার 'কোকিলের জল কত উঠল গা?' আর গরমের কালে প্রশ্নটা হয়: 'কোকিল তো শুখেচে, কী জল খাচ্চো?'

এমন-যে মঙ্গলপুর, তার আর কী খবর রাখবে পৃথিবী? পাশের গাঁয়ের লোকজনকে শুধালেও একটাই উত্তর মেলে: 'ওই হোতা!'

'ওই হোতা!'-যে কত মাইল, কি কত ক্রোশ, কেউ বলতে পারে না।

কলকাতা থেকে আসা কাগজের রিপোর্টার মোহনবাবু পলাশগড়ে বাস থেকে নেমে 'ওই হোতা!', 'ওই হোতা!' শুনতে শুনতে একদুপুর হেঁটে ভরবৈকালে মঙ্গলপুরে আসতে পেরেছিল। শেষে অভিমন্যুর চায়ের দোকানে বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলেছিল, 'বাপ রে! 'ওই হোতা'র দেখি শেষ নেই! তা এই 'হোতা' আসলে কতখানি?'

ছোট্ট গেলাসে চা এনে টেবিলে ঠক করে রেখে অভিমন্যু বলেছিল, 'হোতা বলতি আর কদ্দূর বুঝাব সাহেব? এই ধরেন ইখান থেকে উখানে!'

এই বলে অভিমন্যু দূরের ক'টা তালগাছ দেখাল।

মোহনের মনে পড়ল—ঠিক এইভাবেই দেখিয়ে দেখিয়ে একুশ জনায় তাকে পলাশগড় থেকে এখানে পাঠিয়েছে! বাসরাস্তা থেকে নেমে মেঠো পথ ধরে এগোতে এগোতে একসময় ও কোকিলের ধারে এসে পড়েছিল, দেখেছিল দূরে কোথা দিয়ে হুস-হুস করে ধোঁয়া ছেড়ে রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে অন্য কোথায়, অন্য কোনখানে! আসার আগে জেনে গিয়েছিল কোনও ট্রেনই মঙ্গলপুরে থামে না, এখানে কোনও স্টেশন নেই। বাস, লরি, মোটরগাড়িরাও পাশ দিয়ে বয়ে যায় কোকিল আর অজয়ের মতো।

মঙ্গলপুরের শান্তিপূর্ণ নিস্তরঙ্গ জীবনে ওই নদী, গাড়ি, ট্রেনের মতো কোনও অতিনাটকীয় ঘটনাও কখনও থামার চেষ্টা করেনি। মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনও ঘটনাই ঘটে না মঙ্গলপুরে। তাই হালে যখন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী জলের সন্ধানে গভীর নলকূপ খোঁড়ার ছক কষে গাঁয়ে এলো, সারা মঙ্গলপুরে কথা চালাচালি শুরু হল।

'এবার গাঁ-টার একটা বিহিত হল বলে। কেন-রে বাপু, মেঘ শুকালেই জল ফুরাতে হবে? কেন, কল বসিয়ে জল করা যায় না? যেমন করে শুনা যায় দূর-দূরের নগরে। যিখানে মামলা লড়তি যায়

ফণী উকিল। যিখান থিকে হোমোপাতি ওষুধ নিয়ে আসেন সরকার ডাগডারবাবু। অমন নগর-গঞ্জ অনেক দিখা আছে পোস্টাপিসের মোতি পরামানিকের। সে-ই তো খবর দিল মঙ্গলপুরে বাড়ের দিন আসিছে। নলকূপ বসছে, ইস্টিশন হবে শিগগির, দু'টা আরও ইস্কুল হবে, চাষের জমিতে নতুন কেরামতি লাগবে! বলতি কী, দু'টা হোটলও উঠবে সাহেবসুবা, কারিগরদের জন্য। মঙ্গলপুরের মঙ্গলই হবে।'

ঘটনা কিচ্ছুই নেই, তবু কী-একটা হব-হব ভাব ধরেছিল মঙ্গলপুরে। যে-গাঁয়ের খবর পাশের গাঁ-ই রাখে না, হঠাৎ একদিন, ১৯৬৯-এর আশ্বিনে কী করেই যেন তার নাম সবার মুখে!

'কী করেই যেন' বলাটা ঠিক হল না। ঘটনা একটা ছিলই, তবে নিতান্তই ক্ষুদ্র ঘটনা।

আবার 'ক্ষুদ্র ঘটনা'-ই বা বলা যায় কী করে? যে-ঘটনায় একটা গোটা গাঁ জেগে উঠে নাম কিনল চারপাশে, সে কি আর ক্ষুদ্র থাকে?

তবে শুরুটা ক্ষুদ্রই ছিল। আশ্বিনের আর-পাঁচটা দিনের মতো এক ভোরের দৃশ্য দিয়ে। ভোরের আলোয় নরম রঙে ধরা। যখন চোখে-মুখে দু'-আঁজলা জল ছিটিয়ে হাবা পদ্মবনের দিকে ছুট দিয়েছিল দাঁতন করতে করতে। নাতির ওই পগার পার হওয়া দেখে ঠাক্‌মা হাঁক দিতে লাগে, 'কই যাস, হাবু? কই যাস তুই?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! হাবার কণ্ঠে ততক্ষণে গান ধরেছে—সেও ওই ঠাক্‌মার থেকে তোলা —'রাই জাগো, রাই জাগো, শুকসারী বলে রে'। এক সময় দাঁতন ফেলে পুকুরজলে মুখ ধুয়ে হাবা পদ্মবনের শোভা দেখতে লাগল।

'ইস্, কী সুন্দর ওই পদ্মগুলো—'ওর মন বলল। কী ভেবে ডেকে বসল ঠাক্‌মাকে, 'ঠাক্‌মা, এসে দ্যাখো, আরও সাতটা পদ্ম খুলেছে!'

বয়সের ভারে বেঁকে গেছে ঠাক্‌মা, ওইভাবেই সক্কালে ঝাঁট দিচ্ছিল উঠোনে। এই বয়সে এ কি চাট্টিখানি কাজ! তার উপর হাবুর আদিখ্যেতে। মুখ ঝামটা দিল ঠাক্‌মা, 'নিকুচি করেছে তোর পদ্মর। বলি, আমি মরি বাতের জ্বালায়, উনি মোরে পদ্ম দেকাচ্চেন!'

হাবা ফের পদ্ম দেখায় মন দিল। আর গুচ্ছ গুচ্ছ পদ্মর মধ্যে একটা কী-যেন ঝলকে উঠতে দেখল! সোনার মতন কী-একটা! দিনের প্রথম আলোয় বলে কি...?

হাবার অত বোঝার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। ওর এই সক্কালবেলা পুকুরপাড়, দিঘির ধার, নদীর ঘাটে বসলে, জগৎটাকে কেমন স্বপ্ন-স্বপ্ন ঠেকে! মনে হয় এই ছবি পৃথিবীর নয়, অন্য কোথাকার!

শেষে পেটে খিদের টান ধরলে, হয় ঠাক্‌মা, নয় অভিমন্যুখুড়োর দোকানের দিকে হন্টন দেয়। ঠাক্‌মা আর কী দেবে, চাট্টি পান্তাভাত কি মুড়ি। চা-দোকানে গেলে একটু ভিখ্যে করতে হয়, তাতে একটু চা-বিস্কুট জোটে। আর সে চা-বিস্কুটে কী সোয়াদ!

হাবা পুকুরপাড় থেকে উঠে অভিমন্যুর চা-দোকানের দিকে হাঁটা দিল। ঠোঁটে সেই 'রাই জাগো, রাই জাগো' কেত্তন। জিভে চায়ের তেষ্টা। (ক্রমশ)

লেখকের নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

	ছোটদের বই	
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	**হেমেন্দ্রকুমার রায়**	**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
মহেশ (সচিত্র) ৫.০০	যকের ধন ২০.০০	ঘনাদার গল্প ২০.০০
ছেলেবেলার গল্প ৮.০০		অদ্বিতীয় ঘনাদা ১৫.০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	**পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**	**ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়**
একে তিন তিনে এক ১৫.০০	বাহাত্তুরে ২৫.০০	ঘরের ছেলে বাহিরে ১৬.০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	**বরেন গঙ্গোপাধ্যায়**	**ধীরেন্দ্রলাল ধর**
ক্ষীর নদীর কূলে (ছড়াসংকলন) ২৫.০০	ইয়েতি রহস্য ১৫.০০	মহামণি কথা ২০.০০

এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩। ফোন ২২৪১৭৪৯০

অজয় হোম

দুধখেকোদের কথা

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের বর্গ হল ডিমপ্রসবকারী। অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো গায়ে লোম ও রক্তে উষ্ণতা থাকলেও, এরা ডিম পাড়ে এবং 'তা' দিয়ে ডিম ফোটাবার পর বাচ্চাদের স্তন্যপান করায়। এদের আর-এক নাম অণ্ডজস্তনী।

অন্য স্তন্যপায়ীদের চাইতে এদের রক্তের উষ্ণতা বেশ মৃদু। পাখিদের মতো ডিম পাড়া এবং আরও দু'-একটা ধাঁধা-লাগানো সাদৃশ্য দেখে আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন—পক্ষিকুলের সঙ্গে এদের একটা নিকটসম্পর্ক আছে। সেটা ঠিক নয়। অন্যদের মতো সোজাসুজি সরীসৃপকুল থেকেই এদের উদ্ভব, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে উত্তরণের একটা পদক্ষেপ।

এরা স্তন্যপায়ী কিনা, এ-নিয়েও সন্দেহ ছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলন্ডে প্রথম যখন এরা গুটিকয়েক চালান যায়, তখন বিজ্ঞানীরা মহা ফাঁপড়ে পড়েন। শেষে ১৮০২ সালে শারীরবিদ্যাবিশারদ এভারার্ড হোম অঙ্গব্যবচ্ছেদ করে সব সন্দেহ দূর করেন।

এদের বৈজ্ঞানিক নাম মনোট্রেম কথার অর্থ 'একটা পথ'। এককথায় 'একবিধ'। ওই একটা পথেই এই বর্গের প্রাণীদের মলমূত্র ত্যাগ, প্রজনন এবং স্ত্রী-জাতির ডিমপ্রসব—সব কাজই হয়।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্যেই এদের যা-কিছু মূল্য, না-হলে অণ্ডজস্তনী বা ডিমপ্রসবকারীরা মানুষের কোনও কাজেই লাগে না। মধ্যকল্পের (মেসোজোইক) রক্তাশ্ম যুগে (ট্রায়াসিক) স্তন্যপায়ীসদৃশ সরীসৃপ থেকে এই বর্গের উদ্ভব হবার পর, এরা এখন শুধু অস্ট্রেলিয়া এবং তার আশপাশের টাসমানিয়া আর নিউগিনির মধ্যেই আটকে আছে। অবিশ্যি অন্য কোথাও এরা নিভৃতে আত্মগোপন করে থাকতেও পারে। প্রায় দুশো বছরেরও কিছু আগে সভ্যজগৎ এদের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে। তার আগে কেবল ওই দেশগুলোর আদিম অধিবাসিরাই এদের খবর রাখত।

একবিধের প্রথম আবির্ভাবের ইতিহাস নিয়েও বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। নানা মুনির নানা মত। প্রাতিনূতন (প্লিসটোসিন) যুগ পর্যন্ত সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তার আগের ইতিহাস এখনও অন্ধকারে। এর কারণ, বহু যুগ ধরেই একবিধ বা ডিমপ্রসবকারীরা সবদিক দিয়ে স্তন্যপায়ী পরিবারে নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং একটা বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করেছে। এও মনে করা যেতে পারে—একবিধরা

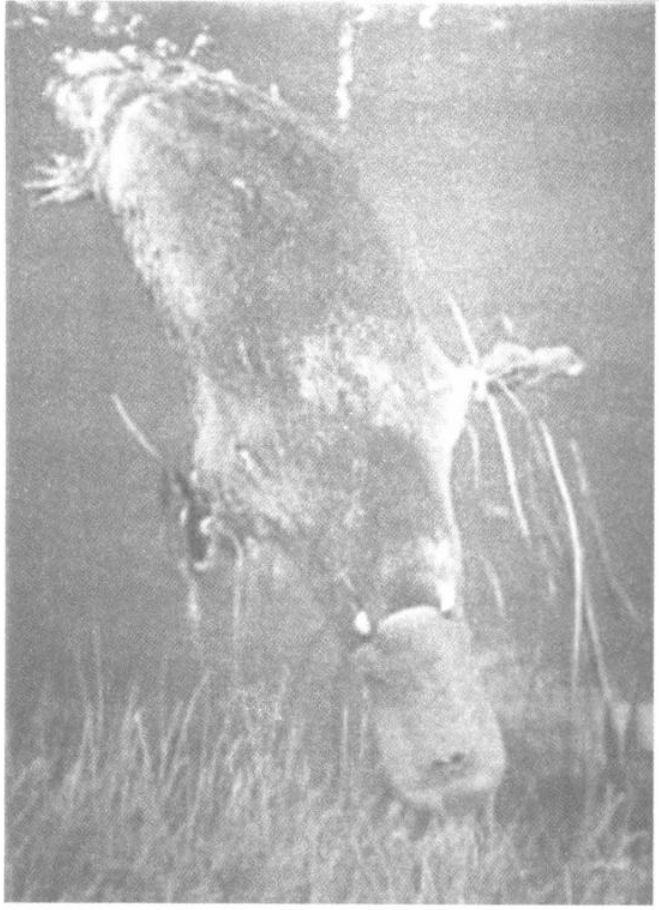

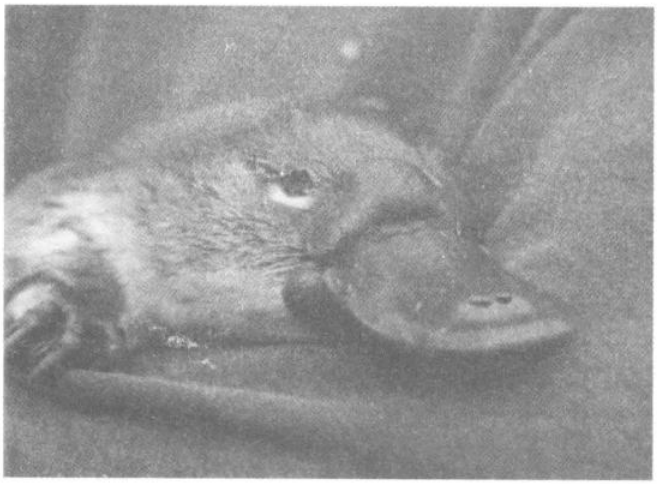

নিজেরাই স্বাধীনভাবে সরীসৃপ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আদিবর্গ আধাসরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী হব-হব সাইনোডনসিয়া থেকে নয়। কিন্তু এখনও পরিষ্কারভাবে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হয়নি। সুতরাং, সাইনোডনসিয়া থেকেই এদের উদ্ভব বলে আমাদের মেনে নিতে হবে।

একবিধ বা ডিমপ্রসবকারীদের সম্পূর্ণ ইতিহাস—অর্থাৎ, এদের পূর্বপুরুষের ইতিবৃত্ত জানতে না-পারাটা খুব-একটা আশ্চর্যের নয়। নবকল্প (টারসিয়ারি) বা তার কিছু আগে থেকেই এরা একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই আটকে পড়েছে। প্রাতিনূতনের (প্লিসটোসিন) আগে অস্ট্রেলিয়ায় স্তন্যপায়ী প্রাণী যে কী ছিল, তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এমনিতেই মধ্যকল্পের (মেসোজোইক) যে-সব জন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সংখ্যা নগণ্য। তারমধ্যে ডিমপ্রসবকারীর সঙ্গে যে কারও সম্পর্ক আছে, তা বলাও শক্ত। মনে হয়, যদি কোনওদিন এদের সম্বন্ধে আরও জানতে পারা যায়, তবে দেখা যাবে—মধ্যকল্পেই (মেসোজোইক) এশিয়ার বুকে এদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস শুরু হয়েছিল। মধ্যকল্পের শেষভাগে খড়ি যুগে (ক্রিটেশাস) মাত্র পাঁচটা প্রজাতির খবর এশিয়া থেকে উদ্ধার হয়েছে। আরও কত-যে মাটির বুকে লুকনো আছে, কে বলবে!

অণ্ডজস্তনী বা ডিমপ্রসবকারীদের ডিমের খোলা অনেকটা সাপ-গিরগিটিদের যেমন প্লাসটিক বা রবারের মতো হয়, তেমনই। ইচ্ছেমতো দোমড়ানো যায়। ডিমও খুব ছোট্ট। ডান ও বাম ডিম্বনালি (ওভিডাক্ট) সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো এদের জরায়ুর কোনও বালাই নেই। এদের স্তনে বোঁটার কোনও আভাস নেই, নেই কোনও পরিপুষ্টতা। শুধু একটু জায়গা জুড়ে চাপা গ্রন্থি। ডিম ফুটে বাচ্চা হবার পর সদ্যোজাতরা সেই চাপা অংশটা চাটে। ওই বসা গ্রন্থির জায়গাটার ওপর ঘামের মতো দুধ বেরোয়।

মোরগের যেমন লড়ায়ে-নখ হয়, তেমনি এদের পেছনের পায়ে গোড়ালির কাছে নখ দেখা যায়। কিন্তু ওই বাঁকানো নখটা ফাঁপা। ফাঁপা নখের পথটা হচ্ছে সাপের বিষাক্ত দাঁতের মতোই। এরাও ওই পথে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ ত্যাগ করে।

যাবতীয় স্তন্যপায়ীদের মতোই এদের চুল এবং মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) আছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত কঙ্কালটা পরীক্ষা করলে দেখা যায়—সরীসৃপের চাইতে পরবর্তী বর্গ শিশুধানিন বা অঙ্কগর্ভর (মারসুপিয়াল) সঙ্গে এদের মিল বেশি। অক্ষকাস্থি (কলারবোন) থেকে উরঃফলককে (স্টারনাম) জুড়ে রাখে ইংরেজি টি-এর মতো একটা হাড়, সেটা আবার সরীসৃপের মধ্যেও দেখা যায়।

এই বর্গে মাত্র দু'-জাতীয় প্রাণী আছে। (১) হংসচঞ্চু। (২) একিডনা। অর্থাৎ, সজারু-সদৃশ পিপীলিকাভুক।

হংসচঞ্চুর ইংরেজি নাম ডাকবিল বা প্লাটিপাস। বৈজ্ঞানিক নাম অর্নিথরহিস্কাস অ্যানাটিনাস। গোলাকার দেহ, লম্বায় প্রায় দু'-ফুট, তারমধ্যে চ্যাপ্টা লোমশ ল্যাজ প্রায় ছ'-ইঞ্চি। ওজনে প্রায় দু'-কিলো পর্যন্ত হয়। পা বেঁটে, পাঁচটা তীক্ষ্ণ নখযুক্ত। সামনের পায়ে নখের মাঝে হাঁসের মতো ঝিল্লি দিয়ে জোড়া। সেই ঝিল্লির অবস্থান নখ ছাড়িয়ে, সাঁতার কাটার সময় এর প্রয়োজন। মাটিতে গর্ত খোঁড়া বা চলার সময় ঝিল্লি গুটিয়ে থাবার নীচে রেখে দেয়। পেছনের পায়ে ঝিল্লি নেই। ঠোঁট হাঁসের মতো দেখতে, তবে পাখির চঞ্চুর মতো শিং-এর উপাদানে তার গঠন নয়। কোনও স্তন্যপায়ীর নাক ও ঠোঁট টেনে চ্যাপ্টা ও লম্বা করলে যেমন হয়, তেমনি নরম চামড়ার—দেখায় যেন রবারের। দেখলে মনে হয়—অন্য কোনও প্রাণীর এই অদ্ভুত চঞ্চু বা ঠোঁট এনে সার্জারি করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ুতে ভর্তি। জলের তলায় বন্ধচোখে খাবার খোঁজার সময় ওই ঠোঁটের সামান্যতম স্পর্শ দিয়েই খাদ্যকে অনুভব করতে পারে। ওপরের ঠোঁটের রঙ বেগুনি-কালো, নীচের অংশে হলদে ও কালোর ছোপ। অন্য পশুদের মতো কান বাইরে বের করা নয়, পাখিদের মতো মাথার দু'-পাশে লোমের ভেতর ছোট ছ্যাঁদা। চোখ খুব ছোট। জলের ভেতর যখন চলে বা সাঁতার দেয়, তখন চোখ ও কানের ওপর পর্দা পড়ে ঢেকে যায়। গায়ের লোম মোটা, নরম ও পশমি। পিঠের রঙ গাঢ় বাদামি, বুক-পেটের লোম ধূসর-সাদা থেকে হলদে। পুরুষের পেছনের দু'-পায়ে লড়াইয়ে-মোরগের নখের মতো ফাঁপা শিং আছে, যা বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত। কেবল আত্মরক্ষার্থে এর ব্যবহার হয়। এই বিষে মানুষ মরে না, কিন্তু একটা কুকুর মারা যেতে পারে। স্ত্রী-জাতির এই নখ ও বিষগ্রন্থি থাকে না। বাচ্চা অবস্থায় এদের ওপরের চোয়ালে দুই বা তিনজোড়া এবং নীচের চোয়ালে দু'-জোড়া দাঁত থাকে, বড় হলে এই দাঁত শক্ত শিং-এর মতো দেখতে হয়।

পূর্ব আর দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়ার ছোট-বড় নদীতে এদের বাসস্থান। বেশি সময় জলে থাকলেও, একনাগাড়ে এক থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি জলে ডুবে থাকতে পারে না। আগে এদের জল-ছুঁচো বলা হত। এরা নিশাচর। নদীর পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। তবে গর্তের মুখ থাকে জলের ধারে এবং জল থেকে একটু উঁচুতে। কখনওবা গর্তের মুখ থাকে জলের ভেতর, এমনও দেখা যায়। এদের স্বভাব সদাই অস্থির আর প্রাণচঞ্চল। একমুহূর্ত স্থির থাকে না।

হংসচঞ্চুর খাদ্য জলজ-পোকামাকড় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডহীন প্রাণী—যেমন শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি। খায় প্রচুর, দেহের ওজনের অনুপাতেই দৈনিক আহার। জলের তলায় খাদ্যসংগ্রহ করেই ডাঙায় উঠে আসে। সেটা গলাধঃকরণ করেই, আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সবচেয়ে সক্রিয় হয় ভোরবেলা এবং সন্ধ্যেয়। তখন দেখা যায় নিঃশব্দে জলে ডুব দিতে এবং সাঁতার কাটতে। জলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেসে চলে, আবার ডুব দেয়। শীতকালে অল্প কয়েকদিনের জন্য শীতঘুমও দেয়।

প্রজননকাল আগস্ট থেকে নভেম্বর। জলেই মিলন সংঘটিত হয়। কোর্টশিপের দৌড়ঝাঁপ নানা কায়দায়—তার একটা হচ্ছে : স্ত্রীর ল্যাজটা পুরুষ তার ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে, আর ওই অবস্থায় দু'জনে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটে। বাসস্থানের গর্ত ওপরের জমি থেকে এক ফুট নীচের মধ্যেই থাকে, কিন্তু লম্বায় দেখা গেছে ১৮ মিটার পর্যন্ত। এই লম্বা গর্তের মধ্যে থাকে শাখাপ্রশাখা। একটা শাখা—যা সবচেয়ে আঁকাবাঁকা—তার শেষে প্রসূতি-আগার। ওই কক্ষটাতে ঘাস ও ইউক্যালিপটাসের পাতা বিছানো। ডিম পাড়তে যাবার সময় ল্যাজ দিয়ে মাটি নাড়িয়ে পথ বন্ধ করতে করতে প্রসূতি-আগারের দিকে যায়। গর্ভধারণের সময় ১৫ দিন। ডিম পাড়ে সাধারণত দুটো, কখনও একটা, কদাচিৎ তিনটে। ডিম লম্বায় পৌনে এক ইঞ্চি, চওড়ায় আধ ইঞ্চি। সাপের ডিমের মতো নরম চামড়ার, দোমড়ানো যায় এবং রঙ সাদাটে। তলপেটের নীচে ডিম রেখে 'তা' দিয়ে আট থেকে দশদিনেই বাচ্চা ফোটায়। সদ্যপ্রসূতের গায়ে লোম থাকে না, চোখ বন্ধ। মা-হংসচঞ্চুর পেটের ওপর খুব ছোট-ছোট ছ্যাঁদা দিয়ে (বোঁটা নেই) দুধ ক্ষরণ হয়। সেই দুধ বাচ্চারা চেটে খায়। ১১ সপ্তাহে চোখ ফোটে। চারমাস পূর্ণ হলে বাচ্চাকে জলে নামায় মা ।

হাঁসঠুঁটো বা হংসচঞ্চুরা সাধারণত ১০ থেকে ১৫ বছর বাঁচে। শরীরের উষ্ণতা মোটামুটি ৩২.২° সেন্টিগ্রেড। মাঝে-মধ্যে গলা দিয়ে মৃদু গোঙানির আওয়াজ বেরোয়। বয়স্ক পুরুষের গায়ের গন্ধ প্রায় শেয়ালের বোঁটকা গন্ধের মতো। ঘাড়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে এই গন্ধটা বেরোয়।

নরম পশমি লোম ও চামড়ার জন্যে এদের আগে খুবই হত্যা করা হত। তার ফলে এই অদ্ভুত স্তন্যপায়ীটির প্রায় লুপ্ত হবার দশা! আইন করে এখন এদের রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে।

একিডনার ইংরেজি নাম স্পাইনি অ্যান্টইটার। অর্থাৎ, কাঁটাওয়ালা পিপীলিকাভুক। বৈজ্ঞানিক নাম ট্যাকাইগ্লেসাস অ্যাকিউলিএটাস। সজারুসদৃশ এই পিপীলিকাভুকের দেহ গোলাকার, পিঠ একটু চ্যাপ্টা। লম্বায় দু'-ফুট পর্যন্ত হয়। ওপরের অংশ ঘন কালো লোম ও সজারুর মতো কাঁটায় মেশানো, তলার অংশ সবই ঘন কালো লোমে ঢাকা। ল্যাজ নেই। কান দেখা যায় না, শুধু ঘন লোমের তলায় দু'-পাশে দুটো ছ্যাঁদা। ঠোঁটটা পাখির ঠোঁটের উপাদানে গঠিত, কিন্তু বন্দুকের নলের মতো লম্বাটে, খুব সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন। চোয়ালে কোনও দাঁত নেই, কিন্তু লম্বা জিভের পেছনে উঁচু-উঁচু শিং-এর মতো কয়েকটা দাঁত আছে, তাই দিয়ে খাদ্যবস্তুকে ওপরের টাকরায় পিষে খায়। পা বেঁটে, পায়ের পাতায় পাঁচটা শক্ত মোটা নখ।

বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া ও নিউগিনি। সাধারণত ঘন জঙ্গলে, কখনওবা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় থাকতে দেখা যায়।

একিডনা স্থলচর। পাথর বা বড়গাছের খোঁদলে বাস করে। খাবারের খোঁজে বড় বড় পাথর ও গাছের গুঁড়ি অনায়াসেই সরিয়ে ফেলতে পারে। শক্ত ধারালো নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে, সরু লম্বা জিভ বাড়িয়ে, প্রধানত উই, সেইসঙ্গে পিঁপড়ে ও অন্য ছোট পোকামাকড় এদের খাদ্য। এত তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়ে নিজের শরীরকে মাটির ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন মাটির মধ্যে ডুবে গেল!

স্ত্রী-একিডনা মে মাস নাগাদ একটা ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর তার লম্বা ঠোঁটে করে তলপেটে একটা বুকপকেটের মতো থলিতে রেখে দেয়, সেখানেই 'তা' দেয়। ডিম ফুটবার পর বাচ্চারা ওই পকেটের মধ্যেই থাকে এবং হংসচঞ্চুর মতোই দুধের ছ্যাঁদা থেকে দুধ চেটে খায়। কয়েক সপ্তাহ পরে মা-একিডনা সন্তানকে রেখে দেয় কোনও নিরাপদ জায়গায়। একটু বড় হলে নিজেই মায়ের তদারকি থেকে আলাদা হয়ে, নিজের জগৎ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

এরা প্রায় ১৫ বছর বাঁচে। শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠনে সরীসৃপের ছাপ খুব বেশি, এবং সরীসৃপদের মতো উপোস করতে খুবই পারঙ্গম। দরকার পড়লে বিনাখাদ্যে একমাসও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। শীতকালে সাপের মতো নির্জীব হয়ে ঘুমোয়। এই অদ্ভুতপ্রাণী কলকাতার চিড়িয়াখানায় একজোড়া আছে।

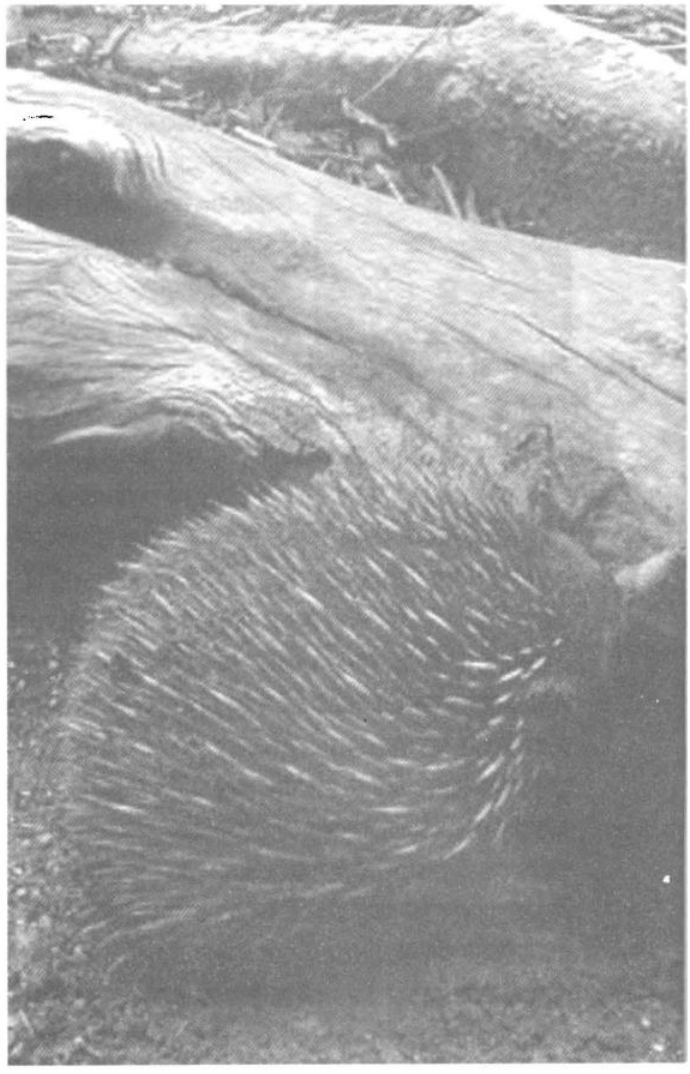

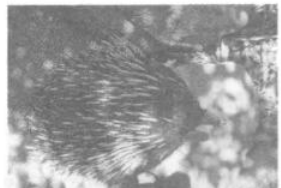

একিডনার একটা ভিন্ন প্রজাতি আছে। নলঠোঁট একিডনা। ইংরেজিতে লং-বিকড্ একিডনা। বৈজ্ঞানিক নাম জ্যাগ্লেসাস ব্রুইজ্নি। বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম নিউগিনি। এদের নলের মতো লম্বা ঠোঁটটা বেশ বড়। পিঠের কাঁটা খুব বেশি নয়। ঘন কালো বড় লোমের আড়ালে কাঁটা প্রায় ঢাকাই থাকে।

নামাঙ্কন: অমল চক্রবর্তী

সুতপা হোমের সৌজন্যে প্রকাশিত

কী দেখবে, কী শুনবে

জগতে আনন্দযজ্ঞে

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
অক্টোবরে বর্ষারাতে মোহন সিং-এর গান।
প্রিয়ংবদা, আস্তে চলো, পিছিয়ে যেতে যেতে
পড়তে হতে পারেও তোমায় মার্লো কিম্বা গ্যেটে—
'অনাধুনিক' শুনতে ভালো, পোস্ট-পটার-এর হুজুগ
কী পড়বেন এবং কেন, নিজে নিজেই বুঝুন—
মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই'
নিভৃত প্রাণ জাগেন একা গোটা জীবনটাই...
কোথায় বাজে প্রেম বেদনা, থমকে আছে ট্রাম
তিনি আছেন হেথায় শুধু গাইতে তোমার গান।

অনসূয়ার এন জি ও-তে যাবার তাড়া থাকে
এস এম এস-এর বার্তাপ্রেরক চুল-গজানো টাকের
এ ভারচুয়াল, সংখ্যালঘু অলৌকিকেও দ্রব
ধর্মভীরুর অঙ্গহানি দুঃখ নব নব।
আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে যান তিনি
যে রাতে তার দুয়ার ভাঙে চিংড়িহাটার তিমির।
যাবার বেলায় ডাকছে বলেই ব্যর্থ হবে নাকি
রাখো রাখো রে জীবনে—বাকিটা থাক বাকি।
কিন্তু আষাঢ় পোস্ট-শরতে পাঠাচ্ছে তার বাণী
ক্যাসেটে তাই রবীন্দ্রগান, আমরা দু'টি প্রাণী!

অনসূয়া? প্রিয়ংবদা? কে এলে কী হতো?
পারত কি কেউ গাইতে এমন মোহন সিং-এর মতো?

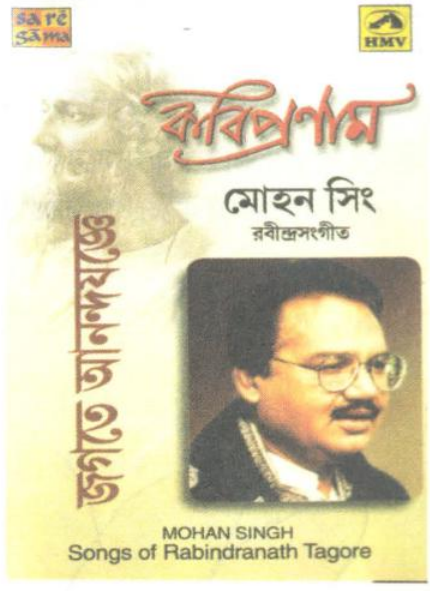

জগতে আনন্দযজ্ঞে
রবীন্দ্রসংগীত। মোহন সিং
সা রে গা মা এইচ এম ভি
৪৫ টাকা

নামাঙ্কন : চণ্ডী লাহিড়ি

সঞ্জয় সিংহ

ঝরা পাতা

বসন্তের গোড়ায় বিষ্ণুদের বাড়ির সামনের কাঠবাদাম গাছটা থেকে সমস্ত পাতা ঝরে গেল। কেবল একটা হলদে পাতা ঝুলে রইল ন্যাড়া ডালটা থেকে। এমন সময় দমকা হাওয়া এলো। উড়িয়ে নিয়ে গেল শেষ পাতাটাকে।

বিষ্ণু ঘুমোচ্ছিল ঘরের মধ্যে। তির-তির করে কাঁপন জাগিয়ে জানলা দিয়ে উড়ে এলো ছোট্ট হলদে পাতা। এসে পড়ল বিষ্ণুর ছড়ানো হাতের ওপর। দু'-বার উল্টিপাল্টি দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

ঘুম ভেঙে গেল বিষ্ণুর। পিটপিট করে তাকাল ছোট্ট পাতাটার দিকে: 'এটা আবার কী-রে বাবা!' ভাবল মনে মনে।

ছোট্ট পাতা বলে উঠল, 'ঘুমোচ্ছ যে! জানলা দিয়ে বাইরে তাকাও—দ্যাখো, বসন্ত এসেছে!'

জানলা দিয়ে তাকিয়ে বিষ্ণু দ্যাখে—অবাক কাণ্ড! বাড়ির সামনের অত্ত বড় কাঠবাদাম গাছটা পাতাটাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে! দূরের শিমুল গাছটা মাথায় চড়িয়েছে রাঙাফুলের মুকুট! আর পলাশ গাছটার ডালে-ডালে যে লাল-লাল ফুলের আগুন লেগে গেছে!

ছোট্ট পাতা বলল, 'তাকিয়ে দ্যাখো-না—তোমাদের বাড়ির বাগানেই রঙ-বেরঙের বাহারি ফুল ফুটেছে! কী সুন্দর বাতাস বইছে! আমি তো সারা বছর এদেরই পথ চেয়ে থাকি।'

বলতে বলতে আবার একটা দমকা হাওয়া এসে তাড়া লাগাল পাতাটাকে। বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে, হাওয়ার হাত ধরে জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছোট্ট ঝরা পাতা।

বিষ্ণুও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাগানে। কত রঙের কত রকম ফুল! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়! খুব ভালো লেগে গেল বিষ্ণুর।

বিষ্ণুকে ইতিউতি খুঁজতে দেখে ডালিয়া ফুল বলে উঠল, 'কাকে খুঁজছ? বাগানে আমার চেয়ে সুন্দর ফুল আর আছে কি?'

অমনি আশপাশ থেকে মুখ বাড়াল গোলাপ-চন্দ্রমল্লিকারা। বলল, 'কেন? আমরাও কি কম সুন্দর ? কত রকম মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়েছি আমরা, টের পাচ্ছ না?'

একটা ঝগড়া পাকিয়ে ওঠার আগেই বিষ্ণু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পারো, কোথায় গেছে ছোট্ট ঝরা পাতা?'

মুখ বেঁকাল ফুলেরা : 'ভারী তো হলদে ঝরা পাতা! দু'-দিনের জন্য আমরা ফুটে উঠি, তাতেই চেহারা ঠিক রাখতে সময় কুলোতে পারি না!'

সুন্দর সুন্দর ফুলদের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিষ্ণু। ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর বসন্তের বাতাস মনটাকে খুশিতে ভরে দিল। কিন্তু কোথাও সেই ঝরা পাতাটা চোখে পড়ল না!

দমকা হাওয়ার পিঠে চেপে ঝরা পাতা ততক্ষণে বসন্তের খবর নিয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে!

ফিরে চলল বিষ্ণু। ডালিয়া ফুল রহস্য করে জিজ্ঞেস করল, 'চললে যে বড়! আমাদের ভালো লাগল না বুঝি?'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'খুব ভালো লাগল। ভারী সুন্দর তোমাদের এই বাগান।'

অমনি ডালিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার দল গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর সবচেয়ে ভালো লাগল কাকে?'

'সবচেয়ে ভালো?' একটুও ইতস্তত না-করে বিষ্ণু উত্তর দিল, 'সবচেয়ে ভালো ছোট্ট ঝরা পাতা। সে-ই তো আমার কাছে বসন্তের খবর এনে দিয়েছিল!'

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায়
২০০ বছর ধরে....

200 YEARS
TAKING YOUR TRUST FORWARD

State Bank of India

With you all the way since 1806

Helpline : 1600 345 3455

www.statebankofindia.com

অল্পবয়স কল্পবয়স

শঙ্খ ঘোষ

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ: দেবব্রত ঘোষ

ভিন্নরকমের নেমতন্ন

নিচু ক্লাসের ছেলেরা তখন অনেকেই মনে মনে ভাবত : আঃ! কবে-যে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষাটা দিতে পারব!

কেন এমন ভাবত তারা? সে কি এইজন্য যে, ইস্কুলটা মোটেই তাদের ভালো লাগত না? তাই তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে চায় সেটা?

তা কিন্তু একেবারেই নয়। ভাবনাটার একটাই মাত্র কারণ: শেষ পরীক্ষা এলেই জবরদস্ত একটা নেমতন্ন পাওয়া যাবে।

এতদিন ক্লাস করবার পর ছেলেরা একেবারে বিদায় নেবে ইস্কুল থেকে, এমন বড় একটা ঘটনাকে মনে রাখবার জন্য ওইরকমই এক ব্যবস্থা করেছিলেন হেডমাস্টারমশাই। নিতান্ত ব্যক্তিগত সেই ব্যবস্থা। আসন্নবিদায় ছাত্রদের একদিন ডাক দিতেন তাঁর বাড়িতে, অঙ্গনে পাতা টুলবেঞ্চিতে সারি সারি বসিয়ে খাওয়াতেন তাদের যত্ন করে। ভোজন শেষে বাইরে এসে সাতকাহন করে
তারা শোনাত সেটা অন্যদের, কথায় কথায় যা বেড়েই যেত অনেকখানি।

ছোটরা তাই ভাবত অনেকসময় : আহা! কবে-যে তারাও ও-অঙ্গনে ঢুকবার অধিকার পাবে একদিন!

পায়নি অবশ্য তারা। কেন-না, কয়েক বছরের মধ্যেই এলো এক দুর্ঘট, এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। চালের জন্য হাহাকারে ভরে উঠেছে গোটা দেশ, হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতেও তরকারিসেদ্ধ খাওয়া চলছে ক'দিন, তখন কে-আর কাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে! বন্ধ হয়ে গেল বিদায়ভোজের সুন্দর একটা মমতামাখানো রীতি।

তা গেল, কিন্তু অনেকদিন পর আমাদের এক বন্ধু নুরুল হকের একটা সুযোগ ঘটল ও-বাড়িতে বসে খাবার। তবে কিনা সে ছিল এক ভিন্নরকমের নেমন্তন্ন!

নুরুল ছিল খুব শান্তশীল, সবসময়েই থাকত চুপচাপ। কিছু বলবার থাকলে সেটা বলত খুব নিচু গলায়। অনেকটা দূরের গাঁ থেকে হেঁটে হেঁটে চলে আসত স্কুলে, খাটো ধুতির সঙ্গে গায়ে থাকত একটা খাকি রঙের জামা। মাস্টারমশাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়েই শুনত সব কথা। কিন্তু মনে রাখতে পারত না ভালো, গুছিয়ে লিখতেও পারত না তেমন।

এই-যে নুরুল, হলো কী, টেস্ট পরীক্ষাটা উতরোতে পারল না সে। ইংরেজি আর অঙ্কে ফেল করে বসেছে। ক্লাসের সব ছেলেই টপকে গেছে বাধা, সব ছেলেই নাটোরে চলে যাবে শেষ পরীক্ষা দিতে, কেবল তারই হবে না যাওয়া! ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে না সে!

শুধু একটি ছেলেকেই আটকে রাখা হবে? ওকেও যদি ছেড়ে দেওয়া হতো, শতকরা একশোজনই তো পাশ করে যেত তবে। কতই-না ভালো হতো সেটা। দু'-একজন মাস্টারমশাই এসে দরবার করেন তাঁদের প্রধানের সামনে। বলেন, 'ওকে ছেড়ে দিলেও তো হয়।'

কিন্তু নিয়মের বাইরে কিছুই করতে রাজি নন আমাদের হেডমাস্টারমশাই।

'তা কী করে হয়? ইংরেজি-অঙ্কে ফেল করেও টেস্ট পরীক্ষায় পাশ, সে তো অসম্ভব। কী করে এটা বলছেন সুরেশবাবু? আমি চাই, স্কুল যাদের শেষ পরীক্ষায় পাঠাবে, সবাই পাশ করবে সসম্মানে। হ্যাঁ, শতকরা একশোজনই। সে-জন্যেই তো আগে থেকে পরখ করা চাই। না-না, ও পরের বার পরীক্ষা দেবে। এ-বছর নয়।'

সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে স্কুল ছেড়ে। সন্ধে হয়ে আসছে। স্কুলবারান্দায় নুরুল চুপ করে বসে আছে তবু। বাড়ি ফিরবার জন্য বেরিয়ে এলেন হেডমাস্টারমশাইও। বাইরে এসে চমকে গেলেন নুরুলকে দেখে। বললেন, 'কী রে? বসে আছিস এখনও? রাত হয়ে যাবে, বাড়ি যা।'

বাড়ির বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে আছেন হেডমাস্টারমশাই। গোটা দিনের ধকলের পর এখন বেশ কাহিল তিনি। মনও খানিকটা মুষড়ে আছে ওই ছেলেটার জন্য। প্রলেপ দিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছে অন্ধকার।

হঠাৎ দেখেন, থামের পাশে একটা ছায়ামূর্তি!

'কে রে ওখানে?' জিজ্ঞেস করেন তিনি।

'স্যার, আমি নুরুল।'

'নুরুল? এখনও বাড়ি যাসনি? যা-যা, বাড়ি ফিরে যা।'

'স্যার, আমাকে অ্যালাউ করে দিন।'

'তা হয় না রে নুরুল। তা কি পারি আমি? ইংরেজি-অঙ্ক কী করে সামলাবি তুই ফাইনালে? হয় না তা।'

'স্যার,কথা দিচ্ছি আপনাকে, কিছুতেই ফেল করব না। একটা শুধু চান্স দিন আমাকে। এই তিন মাস সারাদিনরাত পড়াশোনা করব।'

'এতদিন ধরে যা পারিসনি, তিন মাসে পারবি! যা, বাড়ি যা। ভালো করে পড়াশোনার পর সামনের বছরে পরীক্ষা দিস। দেখবি, ভালো হবে। একটা তো মোটে বছর, দেখতে দেখতে চলে যাবে।'

'আমাকে অ্যালাউ করে দিন স্যার।'

হেডমাস্টারমশাই তখন চুপ করে থাকেন। নুরুলও চুপ। অনেকক্ষণ পরপর সে একটাই শুধু শব্দ বলে, 'স্যার!'

আর হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'হয় না রে, হয় না। বাড়ি যা।'

তারপর একটা সময় থেমে যায় সব। বাড়ির গৃহিণী কখন একটা মোড়া পেতে নুরুলকে বসিয়ে দিয়ে যান তাতে। হেডমাস্টারমশাইয়ের চোখে লাগে তন্দ্রার ঘোর। নুরুলের শুধু শোনা যায় নিঃশ্বাসের শব্দ। আর তারপর, একেবারে হঠাৎ, বাড়িসুদ্ধ সকলের কানে এসে পৌঁছয় একটা আওয়াজ, ধুপ করে যেন পড়ে গেল কেউ!

তন্দ্রা ছুটে গেল হেডমাস্টারমশাইয়ের। কী হলো? শব্দ হলো কীসের? তড়াক করে ছুটে বসেন তিনি। আবছাভাবে দেখেন, মেঝের ওপর পড়ে আছে নুরুলের শরীর। মোড়া থেকে কখন একেবারে ঢলে পড়েছে সে!

সবাই আসে ছুটে। কেউ বলে, 'জল ঢালো চোখেমুখে।' কেউ বলে, 'ডাক্তার! ডাক্তার!'

হট্টগোল শুনে পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে আসেন বিজ্ঞানস্যার সুরেশবাবু।

অস্থির হেডমাস্টারমশাই ছটফট করতে করতে বলতে থাকেন, 'কী সর্বনাশ! ছেলেটা মরেই যাবে নাকি? শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব আমি?'

সুরেশবাবু নাম ধরে ডাকতে থাকেন নুরুলকে। সাড়া নেই কোনও।

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'সুরেশবাবু, ওকে বলুন, টেস্টে ওকে অ্যালাউ করা হচ্ছে। বলুন বলুন।'

নুরুলের কানের কাছে মুখ রেখে সুরেশবাবু বললেন, 'নুরুল, পাশ করেছিস তুই, মাস্টারমশাই বলছেন তুই অ্যালাউড।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে উঠে বসে নুরুল।

ততক্ষণে বাড়ির গৃহিণী নিয়ে এসেছেন এক গ্লাস দুধ। সেটা খেয়ে নিল সে। সকলের, চোখে মুখে স্বস্তি।

নুরুল বলে, 'এবার তবে বাড়ি যাই স্যার।'

'এভাবে একলা কীভাবে যাবি? দাঁড়া, সঙ্গে কেউ যাবে।'

একটু হেসে সুরেশবাবু বলেন, 'কিচ্ছু দরকার নেই, একাই পারবে।'

কিন্তু বাধা দেন গৃহকর্ত্রী: 'গেলেই হলো নাকি? সারাদিন ধরে না-খেয়ে বসে আছে ছেলেটা, খিদে পায় না ওর? না-না, তা হবে না, এখানে খাওয়াদাওয়া করুক, তারপর যাবে।'

শুনে, খুশি হয়ে, হেডমাস্টারমশাই আবার হেলান দিলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। আর রান্নাঘরে, আসন পেতে, পরিপাটি থালাবাটি সাজিয়ে, সামনে বসে থেকে নুরুলকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে লাগলেন তাঁর গৃহিণী।

যাবার সময় সুরেশবাবু শুধু বলে গেলেন আপন মনে: 'খুব বুদ্ধি আছে ছেলেটার। ফন্দিটা বার করেছিল বেশ ভালো।'

ফন্দিই। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইকে দেওয়া তার কথার মর্যাদা রেখেছিল নুরুল। পরের কয়েক মাসের প্রাণান্তক পরিশ্রমে সে সত্যিই পাশ করেছিল ম্যাট্রিকুলেশন। ইস্কুলের ফলাফল একশোয় একশো হবার পথে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি সে।

খুশি হয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই।

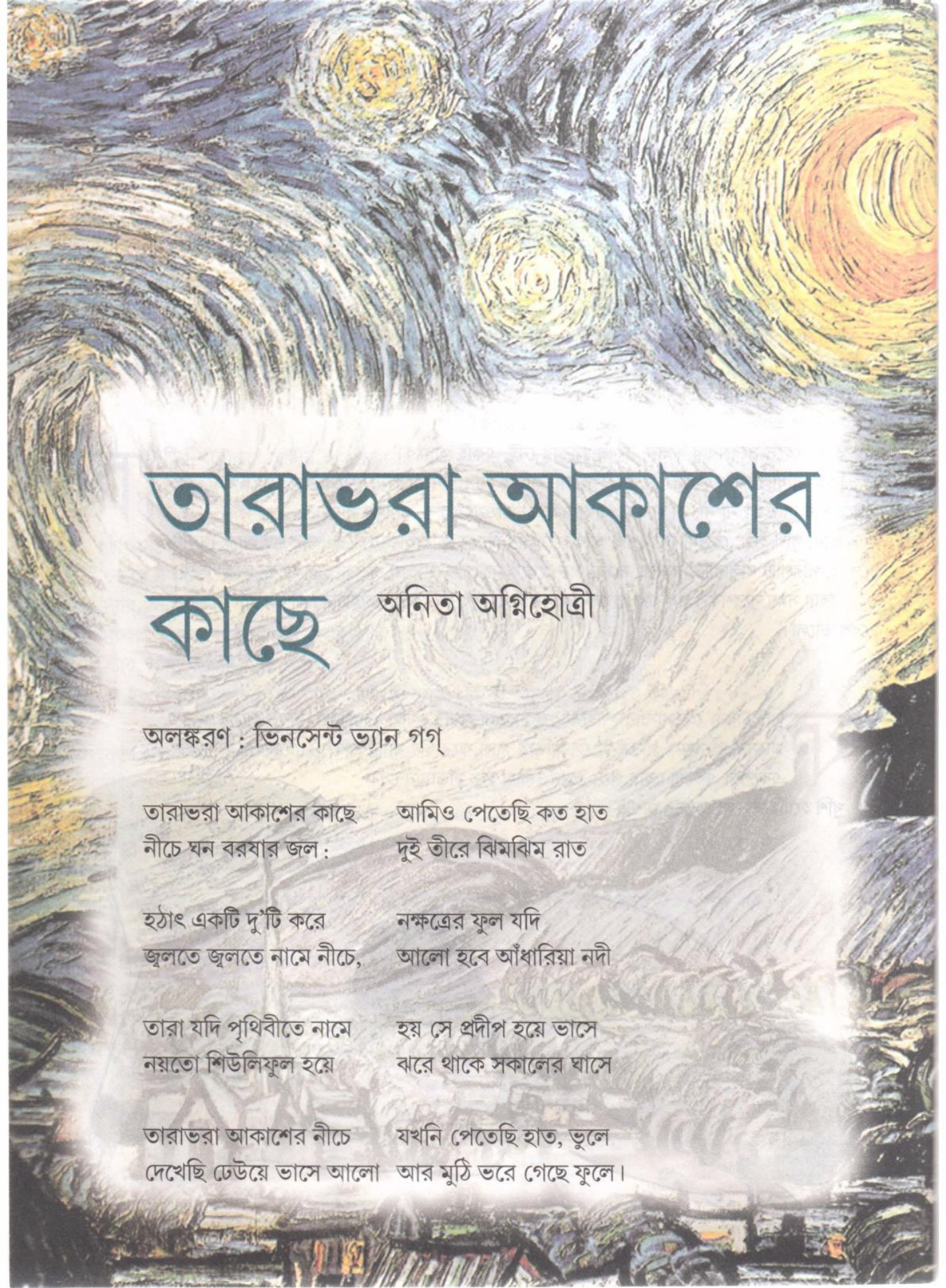

তারাভরা আকাশের কাছে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

অলঙ্করণ : ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্

তারাভরা আকাশের কাছে
নীচে ঘন বরষার জল :

হঠাৎ একটি দু'টি করে
জ্বলতে জ্বলতে নামে নীচে,

তারা যদি পৃথিবীতে নামে
নয়তো শিউলিফুল হয়ে

তারাভরা আকাশের নীচে
দেখেছি ঢেউয়ে ভাসে আলো

আমিও পেতেছি কত হাত
দুই তীরে ঝিমঝিম রাত

নক্ষত্রের ফুল যদি
আলো হবে আঁধারিয়া নদী

হয় সে প্রদীপ হয়ে ভাসে
ঝরে থাকে সকালের ঘাসে

যখনি পেতেছি হাত, ভুলে
আর মুঠি ভরে গেছে ফুলে।

৪

এ-যাবৎ ৪১টা রহস্য-উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে শ্রীযুক্ত জটায়ুর। নতুন প্লটের জন্য এখন বেশ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। নইলে হয়ে পড়ে থোড় বড়ি খাড়া এবং খাড়া বড়ি থোড়। এ-বছরেই, ১৯৮৭ সালে, ওঁরা অপ্সরা থিয়েটারের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ফেলুদার ভাষায় : 'ব্যাপারটা জলের মতো সোজা, অথচ জিলিপির মতো প্যাঁচালো।' দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে পা-মচকে ফেলুদা কয়েকদিন অচল, লালমোহনকে ফেলু মিত্তিরের ভূমিকা নিতে হল! দায়িত্ব পেয়ে লালমোহন গদগদভাবে তোপ্‌সেকে বললেন, 'আমার অনেক দিনের আপশোশ ছিল যে তোমার দাদাকে আর একটু সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারি না। এইবারে তার সুযোগ এসেছে।'ফেলু মিত্তিরের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করার সময় দেখা গেছে—হাঁটাচলা, কথা বলার ঢঙই পালটে গেছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে প্যান্ট-শার্ট। পরিচয়পত্র হিসেবে ওভারনাইট কার্ডও ছাপিয়ে ফেললেন ইংরেজিতে : লালমোহন গাঙ্গুলি, রাইটার।

সমস্ত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেও লালমোহন বুঝেছিলেন : 'প্রশ্ন করাটায় খুব একটা বুদ্ধি লাগে না, আসল কথা হচ্ছে উত্তরগুলো থেকে কী বোঝা গেল।' তোপ্‌সেকে বলেছিলেন, 'তোমার দাদার সঙ্গে আমদের তফাতটা কোথায়, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।' নিজের টাকের ওপর ডান হাতের তর্জনীর ডগা দিয়ে টোকা মেরে বলেছিলেন, 'মাথায়।' কী সহজ সরল স্বীকারোক্তি!

১৯৮৮তে লালমোহনের 'সাংঘাইয়ে সংঘাত' বইটা প্রকাশিত হয়। তাঁর বইয়ের কাটতি খুবই ভালো। রোজগারের দিক দিয়ে যে-কোনও লেখকেরই তাঁকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল! বই থেকে বার্ষিক আয় তিন লাখ ছুঁই-ছুঁই। তার ওপর প্রতি বছরই নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছিল। স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানোর দিকে নজর বেশ কয়েক বছর ধরেই। তাঁকে বলতেও শুনেছি, 'সংসার করিনি, টাকা কার জন্য জমাব বলুন তো? তাই নিজের পেছনেই খরচ করি।'

এ-বছরেই তাঁর মনে হয়েছিল : 'লখ্‌নৌ শহরটা দেখা হয় নাই।' ফেলুবাবুরা লখ্‌নৌ গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপের ঢের আগে, গোয়েন্দাগিরির শুরুর দিকে। খুবই পছন্দের জায়গা, আর-একবার যেতে ফেলুদার আপত্তি হল না। ব্যস, দুন এক্সপ্রেসে তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট, থাকার জন্য লখ্‌নৌ-এর সেরা হোটেল ক্লার্কস্ আওয়াধ।

লখ্‌নৌতেও ফেলুদা তদন্তের কাজে জড়িয়ে পড়লেও, সবসময়ই খেয়াল ছিল তোপ্‌সে আর লালমোহন যেন এমন আশ্চর্যসুন্দর নবাবি-শহরটাকে ভালো করে ঘুরে-বেড়িয়ে দেখতে পারে। আগেরবার তোপ্‌সে যখন এসেছিল, তখন সে খুব-ই ছোট। আর লালমোহনের এই প্রথম আসা। এমন ঐতিহাসিক শহরের মন-মেজাজটা তোপ্‌সে আর জটায়ু পুরোপুরি টের না-পেলে, ফেলুদারও আক্ষেপ কম হবে না।

১৯৮৯ সালে জটায়ুর গল্প নিয়ে টিভি সিরিয়াল হবার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রখর রুদ্রের ভূমিকায় অভিনয় করার মতো অভিনেতা বাংলায় না-পাবার কারণে শেষমেস সেটা ভেস্তে যায়। এ-বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা লালমোহনের বিলেত যাত্রা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণ।

রঞ্জন মজুমদার স্কুল-কলেজ জীবনে বছর পাঁচেক ইংল্যান্ডে ছিলেন। বিলেতে থাকাকালীন এক দুর্ঘটনায় স্কাল ফ্রাকচার,

পাঁচ-সাত বছরের স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। নানা চিকিৎসাতেও কোনও ফল হয়নি। বাড়ির দেরাজের কাগজপত্রের মধ্যে একটা ফোটোর হদিশ পেয়ে কিছুতেই মনে করতে পারেন না—ফোটোতে তার সঙ্গে ছেলেটা কে, কী তার পরিচয়। ফেলু মিত্তিরের নামডাক শুনেই তাঁর কাছে আসা।

ভদ্রলোক অভিজাত পরিবারের। কলকাতায় থাকেন রোল্যান্ড রোডে। বন্ধুটির পরিচয় জানার এতই আগ্রহ, প্রয়োজন হলে ফেলুদা ও তাঁর অ্যাসিস্টেন্টের লন্ডনে যাবার খরচা দিতেও রাজি রঞ্জনবাবু। লালমোহন নিজের খরচাতেই ফেলুদাদের সঙ্গী হতে চান, বিলেত ঘুরে আসার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চান না। আইন অনুযায়ী যতটা ডলার নেওয়া সম্ভব, তাছাড়াও লালমোহন তাঁর ব্যবসাদার প্রতিবেশী চন্দ্রশেখর বোসের কাছ থেকে বেশ কিছু ডলার ম্যানেজ করে নিলেন।

বিলেতের অভিজ্ঞতা লালমোহনের ভাষায় 'সুপার সেনসেশন্যাল'। তাঁর নোটবইয়ে আমরা দেখেছি অক্সফোর্ড স্ট্রিটে বেড়ানো, টিউবে (অর্থাৎ পাতাল রেলে) চড়া, মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ামে গায়ে কাঁটা-দেওয়া চেম্বার অব হররস দেখা, কেমব্রিজ ও সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল, এমনকী শার্লক হোমস-এর বাড়ি ২২১বি বেকার স্ট্রিটের কথা। 'সেল্‌ফ্রিজেস' দোকান থেকে থ্রি পাউন্ডস থার্টি পেন্স দিয়ে একটা ফাউন্টেন পেনও কিনেছিলেন, পরবর্তী উপন্যাসটা বিলিতি কলমে লিখবেন বলে!

এপ্রিল মাসে জটায়ুর নতুন উপন্যাস 'কাম্পুচিয়ায় কম্পমান' বেরনো ছাড়া, ১৯৯০-এ তেমন-কোনও বড় ঘটনা ঘটেনি। তবে কলকাতার সুইনহো স্ট্রিটের বাসিন্দা ডাক্তার রাজেন মুনসীর ডায়রি-রহস্যের তদন্তে ফেলুদার সাফল্যের কথাটাও বলতে হয়। লালমোহনের নজরে পড়ে ফেলু মিত্তিরের মতো জ্বলজ্বল-করা মানুষটার দীপ্তি মাঝে মাঝেই যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে! কখনওবা আনমনাও থাকেন। নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এমন মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করাটা উচিত হবে না ভেবে চুপচাপই ছিলেন।

অবিশ্যি অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারলেও, মূল্যবান ডায়রিটা রক্ষা করতে পারেনি ফেলুদা। রহস্যভেদ হবার আগেই ডায়রি সলিলগর্ভে! ফেলুদার কর্মতৎপরতার মাপকাঠিতে এটা নিশ্চয়ই ব্যর্থতা। তারপর? তারপর সবাইকে অবাক করে দিলেন সাহিত্যিক লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—মূল্যবান লেখাটাকে জিরক্স করে এক কপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন! ফেলুদারও আপশোশ করার কিছু থাকল না!

১৯৯১-এ দেখি তোপ্‌সের নজরে পড়েছে ফেলুদার মনমরা ভাবটা। তাই নিয়ে লালমোহনের সঙ্গে মত বিনিময় করলে, তিনি সাহস পেয়ে ফেলুদার অবস্থার বর্ণনায় যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলেন, তারমধ্যে হতোদ্যম, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ তো ছিলই, এমনকী 'মেদামারা'! 'এটা কিন্তু মশাই আনফেয়ার।' বলে লালমোহন ফেলুদাকে চাঙ্গা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। উত্তরে ফেলুদা যে কথাগুলো বলল, সেটা বোধহয় লালমোহনের প্রতি আরও আনফেয়ার!

তোপ্‌সের বইয়ের কাটতি কমে গেছে, পাঠকরা আর আগ্রহ পাচ্ছে না, এ-কথা ঠিক। কিন্তু তার কারণ হিসেবে লালমোহন 'আর তেমন হাসাতে পারছেন না!'—এটা বলা ভুল। লালমোহনকে সং, ভাঁড়, ক্লাউন বা জোকার বলাটা শুধু অন্যায় নয়, এক ধরনের অপরাধ। 'আপনি হলেন বিদূষক। এইভাবে নিজেকে কল্পনা করে নিলে দেখবেন আর কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।'—বলাটাও বোধহয় তাঁর বন্ধুত্বের প্রতি অবমাননা। লেখা নিয়ে, ঢিলেঢালা স্বভাব নিয়ে, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে খোঁচা দিলে, জটায়ু মেনে নিয়েছেন হাসিমুখে। 'আপনার শ্লেষ ভোজালির চেয়েও তীক্ষ্ণ' বলে মনে করলেও, কোনও ব্যথা জাগেনি। বরং 'কাইন্ডলি এস্‌কিউজ মাই ইগনোরেন্স' বলে মাফ চেয়ে নিয়েছেন।

তোপ্‌সের লেখা কিশোর-কিশোরীদের জন্য, অথচ তার বই পড়ে বাড়ির সকলে। তাই ছোটদের কথা ভেবে যে-কেসগুলোর কথা বইয়ে লেখা যায়, সেগুলো বড়দের ভালো লাগে না—এ-যুক্তি আমাদের বিচারে ধোঁপে টেকে না। এ-সমস্যা তো আগেও ছিল, তখন তো তোপ্‌সের বইয়ের কাটতিও ছিল, এখন এ-কথা উঠছে কেন?

ফেলুদা যেরকম বাছবিচার করে আগে কেসগুলো হাতে নিত,হয়তো এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। অথবা সুলুকসন্ধানের জন্য যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত, সেটা দিতে পারছে না। মোট কথা, সমস্যাটা ফেলুদার দিক থেকে, তোপ্‌সের লেখার জন্য নয়। ফেলুদা তাই ঠিক করেছিল এ-বছর থেকে এমন মামলা নেবে, যেগুলোতে তাকে বেশ যুঝতে হয়। তোপ্‌সের লেখা পড়ে আমরা জেনেছি, সেরকমই একটা কেস নিয়ে ফেলুদাকে লড়তে হয়েছিল। এবং নয়ন রহস্যের সমাধানে খুশি হয়ে লালমোহনও বলেছেন, 'অনেকদিন পরে আপনার চিন্তাশক্তি আর পর্যবেক্ষণের নমুনা পাওয়া গেল। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

এ-বছরই পুজোয় জটায়ুর নতুন উপন্যাস 'লন্ডনে লণ্ডভণ্ড' বের হয়। ক'দিনের মধ্যেই সাড়ে-চার হাজার কপি বিক্রিও হয়ে যায়। লালমোহনের লেখার পাঠক সংখ্যা ক্রমে বেড়েই

চলেছে, তাঁর কারণ অবিশ্যি লেখার কায়দা ছাড়াও ভাষা প্রয়োগ। বিশেষণ প্রয়োগের একটা নমুনা : 'স্তব্ধভাষ, রুদ্ধশ্বাস বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়।' আর বর্ণনার ভাষার নমুনা : 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।' বাঙালি পাঠকদের এমন লেখাই বেশি পছন্দ।

১৯৯২-এর গোড়ার দিকে কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় জনৈক পিটার রবার্টসনের লেখাতে বীরভূমের টেরাকোটা মন্দির সম্পর্কে পড়ে বিশিষ্ট গবেষক ডেভিড ম্যাককাচনের কথা মনে পড়ে ফেলুদার। এই তরুণ ইংরেজ ভদ্রলোক অসম্ভব আর অসাধারণ কাজ করে গেছেন বাংলার এই লুপ্তপ্রায় শিল্পসম্ভার নিয়ে। ইচ্ছে হল আর-একবার গিয়ে এই মন্দিরগুলো দেখে আসার। পিটারের প্রবন্ধটা অবশ্য ডেভিড ম্যাককাচন বা টেরাকোটা মন্দির সম্পর্কে নয়। লেখাতে ওঁদের রেফারেন্স ছিল মাত্র। বিষয়টা ভিন্ন। সিপাহী মিউটিনির সময় পিটারের পূর্বপুরুষ প্যাট্রিক সিপাইদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সে-সময়ে ভারতীয় নবাবদের নানা সম্পদ ইংরেজ সেনারা লুটতরাজ করে। প্যাট্রিকের হাতেও আসে এক মহামূল্যবান রুবি, যেটা পরবর্তীকালে লোকমুখে 'রবার্টসনের রুবি' বলে খ্যাত। পিটার এই দেশে এসেছেন অন্যায্যভাবে হস্তগত করা সেই মহামূল্যবান সম্পদটাকে আসল দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) ফিরিয়ে দেবার জন্য, যাতে তাঁর পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি হয়।

ফেলুদা এমন ঘটনা পড়ে মুগ্ধ! যেখানে আমাদের দেশের লোকেরা লুঠ করে জাতীয় সম্পদ চোরাকারবারি পথে বাইরে পাচার করে দিচ্ছে নিছক অর্থলোলুপতার জন্য, সেখানে একজন বিদেশির এই নীতিজ্ঞান তাকে স্পর্শ করে। বীরভূম যাচ্ছেন পিটারও। সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে—এটাও ফেলুদার ভাবনার মধ্যে ছিল। ফেলুদারা তিনজনেই শান্তিনিকেতনে যায়।

লেখক হয়েও লালমোহন কোনওদিন শান্তিনিকেতন যাননি। যাব-যাব করেও যাওয়া হয়নি। 'ট্যাগোরের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরেচি কিনা, তাই শান্তিনিকেতন-টেতনকে তেমন আর পাত্তা দিইনি।' তিনি যে-ধরনের বইয়ের লেখক, তাতে কবিগুরুর থেকে কী প্রেরণা পেতে পারেন! তার ওপর ট্যাগোরের সঙ্গে ক্রাইমের কোনও সম্পর্ক থাকা একেবারেই অসম্ভব। এ-সব তিনি ভালোভাবেই জানেন, স্বীকার করতেও কোনও ভণ্ডামিও নেই।

লালমোহনের বন্ধু শতদল সেন শান্তিনিকেতনেই থাকেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনিও এই প্রথম তাঁর বন্ধুকে এবং বন্ধুর বন্ধুদের পেয়ে মহাখুশি। শান্তিনিকেতনের আশপাশ, কাছের গ্রাম, নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য লালমোহনের খুবই ভালো লেগেছিল।

তোপ্‌সের লেখাতেই পড়েছি : 'জীবনী লেখার কাজটাও অনেক সময় প্রায় গোয়েন্দাগিরির চেহারা নেয়। এক-একটা নতুন তথ্য এক-একটা ক্লু-এর মতো নতুন দিক খুলে দেয়।' লালমোহনের জীবনী নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে যে-সমস্ত তথ্য বা তাঁর মানসিক গঠনের যে-সব লক্ষণ আমাদের চোখে পড়েছে, তার কয়েকটার ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

আমরা জানি যে, ঠাকুর-দেবতার ওপর অগাধ বিশ্বাস লালমোহনের। মন্দির বা বিগ্রহ দেখলে আপনা-আপনিই হাতদুটো কপাল ছোঁয়। বিপদের আশঙ্কা থাকলে, বেরনোর আগে অন্তত বারআষ্টেক দুর্গানাম আউড়ে নেন। অলৌকিক ক্ষমতায়—সে সাধারণ মানুষই হোক বা সাধু বাবাজিই হোক —তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মতে, এঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নখদর্পণে। এঁদের পরামর্শমতো চললে, জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। পামিস্ট্রিতে তাঁর ষোলোআনা বিশ্বাস। খগেন জ্যোতিষীই তো লালমোহনকে বলেছিলেন, 'তুমি লেখ, তোমার কলমে জাদু আছে।' সে-কথার ওপর ভরসা করেই...না, শখের নয়, পেশাদারি লেখক। আর প্রথম বই থেকেই তাঁর স্পেক্টাকুলার পপুলারিটি!

১৯৮০তে তাঁর আর-এক আশ্চর্য পামিস্টের সঙ্গে দেখা, মৌলিনাথ ভট্টাচার্য। তিনি শুধু-যে দুর্ধর্ষ হাত দেখিয়ে তা নয়, ওরিজিনাল রিসার্চও আছে। বলেন, 'মানুষের মতো বাঁদরের হাতেও রেখা থাকে আর সে রেখা পড়া যায়।' বছর পাঁচেক আগে কৈলাস বোস স্ট্রিটে এক পামিস্ট তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, ফরেন ট্যুর নেই। এই মৌলিনাথ ভট্টাচার্য দেখিয়ে দিলেন : 'স্পষ্ট রয়েছে, না হয়ে যায় না।' ঘটনার দিন দুয়েকের মধ্যেই তাঁদের কাঠমাণ্ডু যাওয়া পাকা!

১৯৮২তে লালমোহন খবরের কাগজ পড়ে খোঁজ পান সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্যর। তিনি সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে অ্যাডভাইস দিয়ে অনেক লোকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মক্কেলরা সব বড় ব্যবসাদার, বড় কোম্পানির মালিক, খবরের কাগজের মালিক, ফিল্মের প্রযোজক। বইয়ের প্রকাশক, উপন্যাসের লেখক। উকিল ব্যারিস্টার ফিল্মস্টার। এঁরা সব ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মেচেদার বাড়ির দরজায় লাইনে দাঁড়িয়ে ধর্ণা দেন পরামর্শ নেবার জন্য। ভট্টাচার্যমশাই লালমোহনের নাম, বয়স, জন্মতারিখ আর পেশা জেনে নিয়ে, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ মিলিয়ে-মিশিয়ে হিসেব করে বলে দিয়েছিলেন, তিন অথবা তিনের গুণণীয়ক তাঁর পক্ষে শুভ। আর গণনা ফলেছিল হাতেনাতে। বইয়ের তৃতীয় নাম 'নরকের নাম কারাকোরাম' রাখার জন্য শুধু বই-বিক্রিই না, জটায়ু-গল্পের দ্বিতীয় হিন্দি ছবিও হয়ে গেল!

আমরা শুনেছি, টিনটোরেটোর যীশুর ঘটনায় হংকং গিয়েও পাচার-করা ছবিটাকে উদ্ধার করা যাবে কিনা—ফেলুদার মনে দ্বিধার উদ্রেক হয়েছিল। লালমোহন বেশ জোরের সঙ্গে ফেলুদাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'ইটালিয়ান উচ্চারণ তিনতোরেত্তোর নামের গোড়াতেই যখন তিন, আর আমি যখন আছি আপনাদের সঙ্গে, তখন মিশন সাকসেসফুল না হয়ে যায় না।' হংকং-এ যাবার এত বড় একটা জাস্টিফিকেশনকে ফেলুদাও তারিফ করে।

ফেলুদা অবিশ্যি পামিস্ট্রিতে বিশ্বাস করে না। যদিও এর ওপর বই ওর সংগ্রহে আছে, আর সেগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে। ফেলুদা বলে, মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ করে আজকের দিনে। কারণ, রোজই প্রমাণ হচ্ছে যে, এমন অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে যায়, যার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানেন না, অথচ জানেন না বলে সেটাকে উড়িয়েও দিতে পারেন না। তবে মনকে সবসময়ই কুসংস্কারমুক্ত করে রাখা উচিত। নইলে যুক্তির কোনও অর্থই থাকবে না। লালমোহনের মন কুসংস্কারের দিকে চলে পড়লে দু'-চারটে কথাও শুনিয়েছে, তবে ফেলুদা অকারণে কারও বিশ্বাসে আঘাত দিতে চায় না। তাই লালমোহন তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি নিয়েই ফেলুদার কাছে এত স্বচ্ছন্দ।

লালমোহনের জীবনে কতগুলো গণনা যেমন ফলেছিল, তেমনি অনেক বুজরুকের পাল্লাতেও পড়েছিলেন। যেমন, কাশীর মছলিবাবা। বাবাজি আসলে রায়বেরিলির জেল-পালানো জালিয়াত। আগে কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় হাত-সাফাইয়ের খেলা দেখাত। এখন কাশীতে মগনলাল মেঘরাজের সাঙাত, অসৎ কাজে মেঘরাজের হাতিয়ার। তাই মছলিবাবার অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর পেছনে গোটাটাই বুজরুকি। অথচ প্রথম দর্শনে ত্যানার চেহারা, সাজপোশাক, কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল—কী থ্রিলিং ব্যাপার! তবে মছলিবাবার ছদ্মখোলস খুলে যাবার পরেও এরকম বাবাজিদের ওপর লালমোহনের ভক্তিতে চিড় ধরেছিল কিনা জানি না!

গোসাঁইপুর গ্রামে আত্মারাম মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর ঘরে প্ল্যানচেটের রকমসকম দেখে লালমোহন ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই, হাত-পা ঠক-ঠক করে কাঁপছিল। তবে এমন একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ উপভোগও করেছিলেন, নইলে কি আর নতুন গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড গোয়েটামালার বদলে গোঁসাইপুরে এনে ফেলতে চান! ওই আত্মারাম লোকটাও জোচ্চর, ঠক। ফেলুদা ও-ব্যাটার মুখোশও খুলে দেয়।

পুরীর লক্ষণ ভট্টাচার্যও আর-একজন খুনে, বদমাশ। ভাগ্যগণনাটা লোক-ভোলানো ছল আর কুকার্যসিদ্ধির উপায়। পেশাদারিত্বে মছলিবাবার মতো চৌকশ আর সেয়ানা—হাতের একটা আঙুল মক্কেলের কপালের ঠিক মাঝখানে ছুঁইয়ে, গড়গড় করে অতীত ভবিষ্যৎ বলে দেয়। পিনিয়ান গ্ল্যান্ড—মানুষের মগজের সবচেয়ে রহস্যময় যে অংশ—তার সঙ্গে যোগস্থাপন করে নাকি সবকিছু দৃশ্যমান করা যায়! ভাগ্যগণনা আর অতীত গণনার সুযোগ নিয়ে হতভাগা তার সাঙাতদের সব অপকর্ম অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে, মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠা করে বেড়ায়। লালমোহন প্রথমবার যখন এর কাছে যান, যথারীতি উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসেন। অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অসামান্য ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে বলেন, 'অতীত জীবনের সব ঘটনা তো বটেই, এমনকী সামনের বই ক'টা এডিশন হবে, সে-কথাও গড়গড় করে বলে দিলেন।' এরকম বুজরুকদের ওপর লালমোহনের বিশ্বাস এ-যাত্রাতেও এতটুকু টলেছিল কিনা, তার কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি।

লালমোহনের মনটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ফেলুদা মাঝে মাঝে খোঁচা দিলেও, তিনি সে-কথা মানতে একেবারেই রাজি নন। বলেন, 'তোমার দাদা যে কুসংস্কারের কথাটা বলেন, সেটা একদম বাজে। আমার মধ্যে ওসব ইয়ে একদম নেই।'

লালমোহনের মুখে আমরা তাঁর প্রিয় কবি ও শিক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের সপ্রশংস উল্লেখ শুনেছি। এথিনিয়াম ইশকুলের এই বাংলার শিক্ষকের কবিতার তিনি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। 'হাইলি ট্যালেন্টেড' বা 'গ্রেট পোয়েট' বলে বর্ণনাই শুধু দেননি, তাঁর কাব্যখ্যাতির যথাযোগ্য প্রচার ও প্রসার না-দেখে, গভীর ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন : 'এই পোড়া দেশে কল্‌কে পেলেন না।'

আমাদেরও মল্লিকমশাইয়ের আশ্চর্য কবিতাবলি পড়ার একমাত্র উৎস তোপ্‌সের লেখা বইগুলো—যেখানে লালমোহনের মুখে কবিতার আবৃত্তির কথা লিখেছে। সব ক'টা পূর্ণ কবিতা নয়, কয়েকটা অংশবিশেষ মাত্র। তবু লালমোহনের প্রিয়তম কবির কবিতার যতটুকু পেয়েছি, তার সবই এখানে জড়ো করে দিলাম। এর থেকে লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পড়া ও বোঝা, কাব্যরুচি এবং সামগ্রিক সাহিত্যবোধের পরিচয় মিলবে। কবিতার গুণাগুণের ভার পাঠকের।

বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের কবিতা লালমোহনের মুখে প্রথম শুনি তাঁদের 'হত্যা'-পুরী বেড়ানোর কাহিনিতে। সমুদ্রের সৌন্দর্য আর বিশালতা দেখে লালমোহন স্বতঃস্ফূর্তভাবে

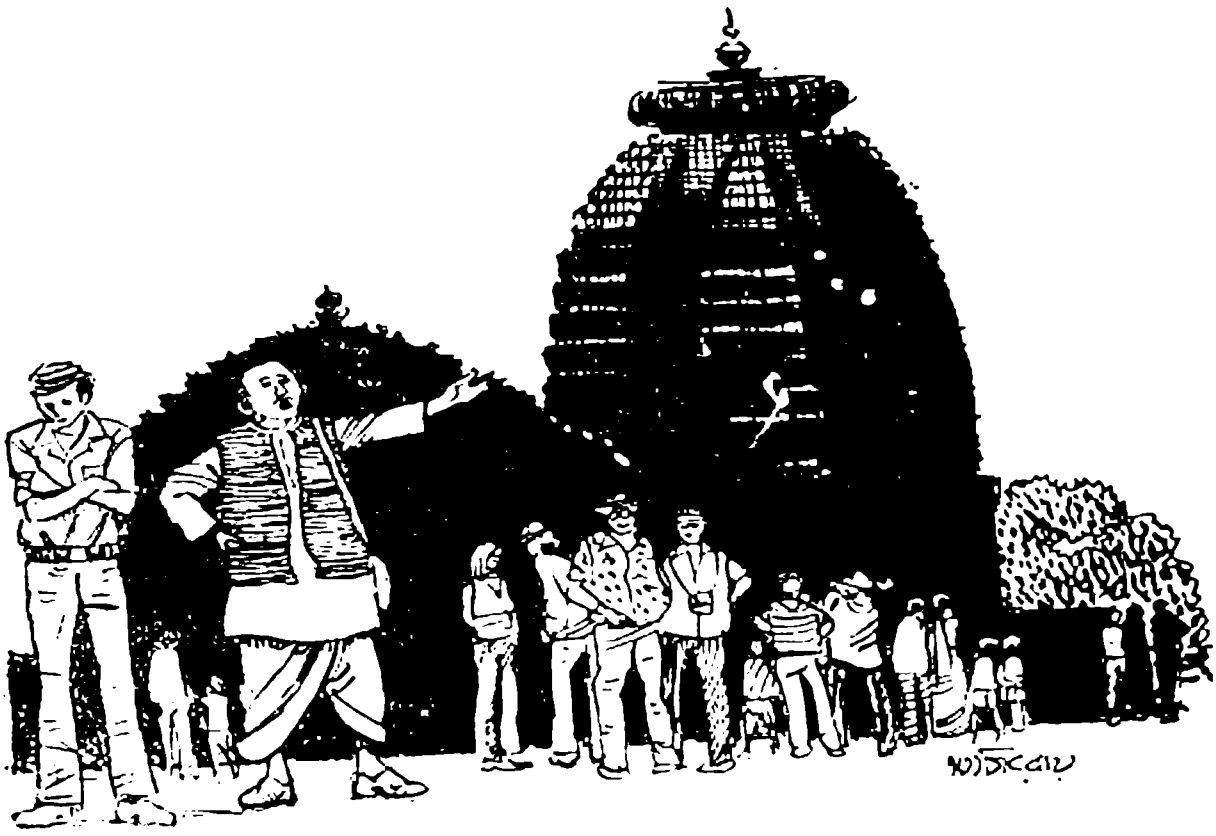

যে-কবিতাটা আবৃত্তি করলেন, তার শেষের দুটো লাইন নাকি পার্টিকুলারলি ভালো :

অসীমের ডাক শুনি' কল্লোল মর্মরে
এক পায়ে খাড়া থাকি এক বালুচরে।

কবিতাটা শুনে ফেলুদা মন্তব্য করেছিলেন 'কবি নিশ্চয়ই এখানে নিজেকে সারসের সঙ্গে আইডেনটিফাই করেছেন, কারণ এই ঝোড়ো বাতাসে বালির উপর মানুষের পক্ষে এক পায়ে খাড়া থাকা চাট্টিখানি কথা নয়!'

ভুবনেশ্বরে গিয়ে লালমোহন ব্যস্ত হয়ে পড়েন সব ক'টা মন্দির দেখার জন্য। কেন-না, ভুবনেশ্বর নিয়ে বৈকুণ্ঠনাথের যে গ্রেট পোয়েমটা আছে, সেটা তাঁকে হন্ট করে। মুক্তেশ্বর মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশজন দেশি-বিদেশি টুরিস্টের সামনে তিনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করেন :

কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঞ্জেলো
একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো—
নীরবে ঘোষিছে তাহা ভাস্কর্যে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর!

এঞ্জেলোর সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'ছিল'কে 'ছেলো' করাটা মোটেই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ বলে তোপ্‌সের মনে হয় না। তাই সে মুখে 'বাঃ' বলে, মনের কথাটা একটু নরম করে বললেও, লালমোহন রেগে গেলেন 'পোয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে ভার্স ক্রিটিসাইজ করার বদ অভ্যাসটা কোথায় পেলে তপেশ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুঁচড়োর লোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলোই বলে। ওতে ভুল নেই।'

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা-রহস্য সমাধানের সময় পানিহাটিতে গঙ্গার ধারে ত্রয়োদশীর চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ফেলুদা দার্শনিকভাবে বলেছিলেন, 'চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কোনওদিন নষ্ট করতে পারবে না।' একটা পাতলা কুয়াশা নদীর ওপারটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবছা গাঢ় জলের ওপর ছড়ানো চাঁদের টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। তারই মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক, হাসনুহানার গন্ধ, ফুরফুর বাতাস প্রকৃতিতে এক মনোরম শোভা বিস্তার করেছে। এরইমধ্যে ফেলুদার কথা শুনে লালমোহন বলে ওঠেন, 'একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে।'

আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে—
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অমাবস্যা—
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রম্‌পশ্যা!

ফেলুদা যেভাবে জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা চুরির রহস্যের সমাধান করে, তা দেখে 'জিনিয়াস' শিরোনামে লেখা বৈকুণ্ঠনাথের কবিতাটা মনে পড়ে যায় লালমোহনের :

অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
দ্য ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।

কেদারযাত্রায় ফেলুদা জটায়ুকে জিজ্ঞেস করে, 'কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, আশা করি?'

শুনে লালমোহন 'হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ' করে হেসে বলেন, 'আমার ধারণাটা বোধহয় আপনার চেয়েও ভিভিড, কারণ কেদার-যাত্রা সম্বন্ধে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক যা লিখে গেছেন, তার তুলনা লিটারেচরে বেশি পাবেন না।'

শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভক্তজন
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয়, সেই পুরাকাল হতে—
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী—

লালমোহন আরও আবেগ দিয়ে বলেন, 'এইবার হচ্ছে আসল ব্যাপার। শুনুন, যাত্রীদের কিভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন ভদ্রলোক—'

তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী—
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগণন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন,
তাও চলে অশ্বারোহী, চলে ডাণ্ডিবাহী,
যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি হবে দূর, পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুণ সর্বশক্তিধর
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বল সবে—কেদারের জয়।

'হুঁ'! বলল ফেলুদা, 'বোঝাই যাচ্ছে, মল্লিকমশাই এ-কবিতা লিখেছিলেন বাস-ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।'

'সার্টেনলি।' বললেন লালমোহনবাবু, 'তাঁকে তীর্থযাত্রীর পুরো ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।'

১৯৮৬। পুলক ঘোষাল আবার ছবি করছেন জটায়ুর গল্প নিয়ে। 'নরকের নাম কারাকোরাম'। গল্পে কারাকোরাম থাকলেও, পুলকের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড দার্জিলিং। সেইসূত্রে শুটিং দেখতে ফেলুদা ও তোপ্‌সেকে সঙ্গে নিয়ে লালমোহনের দার্জিলিং আসা। থাকার ব্যবস্থা করেন হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। সেখান থেকে সরাসরি কাঞ্চনজঙ্ঘা পীক্‌স দেখা যায়।

পৌঁছানোর পরেরদিন ভোরে (১ অক্টোবর) লালমোহন ঘুম থেকে উঠে তাঁর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেন—কাঞ্চনজঙ্ঘা, তাতে সবে সূর্যের গোলাপি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে। এ-জিনিস কারও সঙ্গে শেয়ার না-করলে মজা নেই। তাই তোপ্‌সেকে ঘুম থেকে তুলে এনে পাশে দাঁড় করালেন, বললেন, 'সাল্লাইম।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিশেষণের তোড় : 'স্বর্গীয়' 'হেভেন্‌লি', 'অপার্থিব', 'অনির্বচনীয়'। শেষে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করলেন বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা ছ'-লাইনের কবিতা :

অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে!
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে—
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।

আবৃত্তির শেষে মুখে মুগ্ধতার ভাব নিয়ে বললেন, 'সম্বোধনে আ-কারটা এ-কার হয়ে যায়—সেটাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবি, দেখছ তপেশ? এটাই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ।'

পরের বছর লালমোহনবাবুরা যান কাশ্মীর। সেখানে ডাল লেকের স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে-ওখানে পদ্ম-শালুক শাপলা ফুটে আছে, শিকারা সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলেছে—এমন দৃশ্য দেখেও লালমোহনকে বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কবিতায় পেয়ে বসে।

করি নত শির
তোমারে প্রণমি কাশ্মীর
কুমারীকার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
ঝিলামের জলে ধোয়া অপূর্ব শহর
কত হ্রদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছা।...

'বাঃ দিব্যি!' বলল ফেলুদা। সেটা জটায়ুর মনে কষ্ট না-দেবার জন্য। কবিতায় লালমোহনবাবুর রুচিটা যে একটু গোলমেলে, তার পরিচয় এর আগে অনেকবার পেলেও, জটায়ুর প্রিয় কবি—তার ওপরে শিক্ষক—তাঁর লেখা নিয়ে কটাক্ষ করাটা অনুচিত মনে করে।

১৯৯০-এ নয়ন রহস্য সমাধানের জন্য ফেলুদাদের মাদ্রাজ যেতে হয়। কিন্তু শহরের চেহারা দেখেই লালমোহনের মুখ বেজার। বললেন, 'মশাই, এই শহরের নাম কলকাতা বম্বে দিল্লির সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয় কেন, তার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পশ্চিমবাংলার যে কোনও মফস্বল টাউন এর চেয়ে বেশি গমগমে। তা ছাড়া ডিসেম্বর মাসে গরমটা কীরকম দেখেছেন? আর ইয়ে—আমরা যে-হোটেলে যাচ্ছি, সেখানে দিশি বিদেশি সবরকম খাবার পাওয়া যায় তো? মাদ্রাজি মেনুতে শুনিচি শুধু তিনটে নাম থাকে। আমি খাইয়ে না হতে পারি, কিন্তু যা খাব, সেটা মুখরোচক না হলে আমার সাধ মেটে না।'

এত কথা বলার পরই মনে পড়ে কবি অ্যান্ড পর্যটক বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কবিতা—জাস্ট সিক্স লাইনস্—

বড়ই হতাশ হয়েছি আজ
তোমারে হেরিয়ে মাদ্রাজ!—
ভাষা হেথা দুর্বোধ্য তামিল
অন্য ভাষার সাথে নেই কোনও মিল—
ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা?
ওরে বাবা, এ শহরে কেউ কভু এস না!

'তৃপ্তিবে' শব্দটা শুনে ফেলুদা ভুরু কোঁচকালেও, লালমোহন প্রায় ধমকের সুরে বলেন, 'হোয়াই নট? মল্লিকের ওপর মাইকেলের দস্তুরমতো প্রভাব ছিল। তৃপ্তিবে হল নামধাতু। আপনি গোয়েন্দা তাই হয়তো জানেন না, আমরা সাহিত্যিকরা জানি। বলছি না—হাইলি ট্যালেন্টেড। পোড়া দেশ বলে কল্‌কে পেলেন না।'

বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কথা বলতে গেলেই লালমোহন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আর এতটুকু সমালোচনা করলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

শান্তিনিকেতনের পাশেই গোয়ালপাড়ার মতো খাঁটি গ্রামের চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। রবার্টসনের রুবির রহস্য উদঘাটন করতে ফেলুদারা ওখানে যায় ১৯৯১-এ। এমন একটা গ্রাম দেখে লালমোহনকে কবিতায় পেয়ে বসে। বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা একটা কবিতার খানিকটা অংশের আবৃত্তি শুনি:

বাংলার গ্রামে স্পন্দিছে মোর প্রাণ
সেই কবে দেখা—আজও স্মৃতি অম্লান
যেদিকে ফেরাও দৃষ্টি
মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলে দেখ কী অপরূপ সৃষ্টি!

ওই গ্রামের পাশে কোপাই নদী দেখেও সেই একই ব্যাপার। বৈকুণ্ঠনাথের কবিতা!

জীর্ণ কোপাই সর্পিল গতি
মন বলে দেখে—মনোরম অতি
দুই পাশে ধান
প্রকৃতির দান
দুলে ওঠে সমীরণে,
বলে দেবে কবি
আঁকা রবে ছবি
চিরতরে মোর মনে।

এরপর জটায়ুর মুখে বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের আর-কোনও কবিতা শোনা যায়নি। (আগামী সংখ্যায় শেষ)

নামাঙ্কন : সন্দীপ রায়
অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়

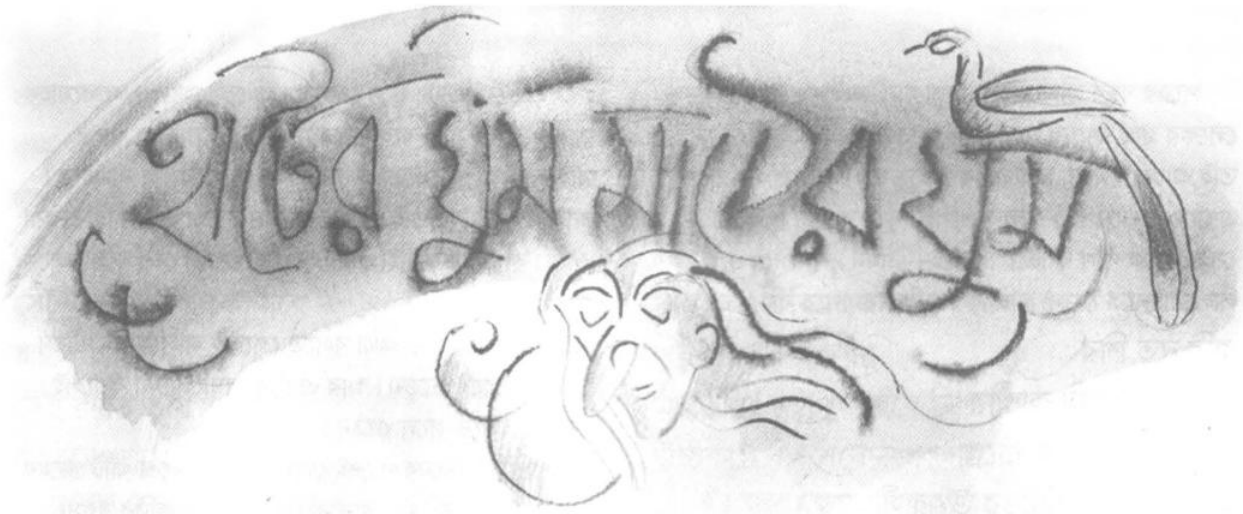

হেমেন্দুশেখর জানা

ক্ষীরনদী, সে ধীর নদী। তীরে তার ছোট্ট একটা বন। বন মানে সে শালবন না, তালবন না, কাশবন না, আঁশবন না, সে হল গে বাঁশবন।

তো সেই বাঁশবনের ভেতর ছোট্ট একটা ঘর। ঘর-লাগোয়া সরু একটা দাওয়া। সেই দাওয়ার ওপর দিনরাত বসে থাকে থুত্থুড়ে এক বুড়ি। বয়স তার কত, কেউ জানে না। বসে থাকে আর চোখ দুটোকে সজাগ রাখে। সজাগ রাখে আর কান দুটোকে তীক্ষ্ণ করে দূরের হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখে। ভাসিয়ে রাখে আর বিড়বিড়িয়ে বলে—

'আমি বাঁশতলার বুড়ি, নাকে মাটি খুঁড়ি
দুষ্টু ছেলে দেখতে পেলে পেটের মধ্যে পুরি।'

ওমা! সে কী!

না-না, ভয়ের কিচ্ছু নেই। সত্যি কি আর পেটের মধ্যে পোরে নাকি! আসলে সে ভয় দেখায়। সেটাই তার কাজ। যেমনি ভয় দেখায়, অমনি যত দুষ্টু ছেলে, তাদের হুড়ুম-দুড়ুম-ধিনতা-ধিতুম দুষ্টুমি সব ফেলেটেলে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। নিপাট ঘুম, জমাট ঘুম। সারারাত্তির শান্তির ঘুম।

ও হরি! তাই বলো।

কিন্তু বুড়িমার এখন খুব দুঃখ।

কেন? দুঃখ কেন?

দুষ্টু ছেলে এখন আর আছে নাকি, যে ভয় দেখাবে! ছেলেরা এখন সব ভালো। সকালে উঠে পড়তে বসে। ইংরেজিতে অঙ্ক কষে। তারপর যেই দশটা বাজে, খুব ভারী একটা ব্যাগ নিয়ে সব ইস্কুলে যায়। ইস্কুলেতে পড়ার ওপর পড়া। এটা করা, ওটা করা, সেটা করা। বাড়ি ফেরে বিকেল যখন যাব-যাব। তারপরে কেউ সাঁতার কাটে। কেউ আবার পার্কে হাঁটে মায়ের সঙ্গে। কেউ চলে যায় কমপিউটার ঝালিয়ে নিতে। তারপরে যেই সন্ধে নামে, ঘরে আসেন গুরুমশাই। এক প্রহরের রাত কেটে যায়। বিদ্যেবোঝাই খোকারা তখন অমনি-অমনি ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই বেড়ানোর ভিসিডি
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই
হীরু ডাকাত
পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প। শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪৫ টাকা
আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ। ৪০ টাকা
গৌর যাযাবর
১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪০ টাকা
ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান। ২০ টাকা
শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত হচ্ছে। ১৫ টাকা
হীরু ডাকাত
গান-বাজনা-অভিনয়ে জমজমাট অডিও সিডি ১ম ও ২য় খণ্ড প্রতিটি ১ ঘণ্টা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের নতুন বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ৫০ টাকা
আমার বনবাস
শহর ছেড়ে, নিজের বাড়ি ছেড়ে, মাকে ছেড়ে এ এক অন্য বনবাসের কাহিনী। ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা
খেলা, যুদ্ধ ও বন্ধুত্বের গল্প। ১৫ টাকা
লেখকের অন্যান্য বই: পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ১৫ টাকা
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি
মৈত্রেয়ী নাগ
ছবি-ছড়ার হট্টমেলা। ৩০ টাকা
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
২৫ টাকা
ছোটদের আরও বই
চড়ুইয়ের সঙ্গে // কানাইলাল চক্রবর্তী
আমার ছেলেবেলা // পূর্ণেন্দু পত্রী ১৮ টাকা
কথামালা ছড়ায় ঢালা // পবিত্র সরকার
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ১৫ টাকা
ভ্রমণ VCD
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চিত্রগ্রহণে
আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে।
আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ
ঘরে বসেই দেখুন জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, হাতি, হরিণ, হায়েনা, জলহস্তি, চিতা, লেপার্ড ও আরও অনেক বিস্ময়কর পশুপাখির অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আদিবাসীদের নাচ গান।
আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগরে।
ঘরে বসে বিশ্বভ্রমণ
কাশ্মীর, কেরালা, কেদার-বদ্রী, হিমাচল, অরুণাচল, গোয়া, ত্রিপুরা, রাজস্থান, বেনারস, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মিশর, রোমানিয়া, মালয়েশিয়া, উত্তর থাইল্যান্ড প্রভৃতি স্বর্গরাজ্যে যখন খুশি ঘুরে বেড়ান। প্রতিটি ১২০ টাকা
মিউজিক ওয়ার্ল্ড, সিম্ফনি, অক্সফোর্ড বুক স্টোর, ল্যান্ডমার্ক, প্ল্যানেট এম ও সব ক্যাসেটের দোকানে পাবেন।
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019, Ph: 2283-2320
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ □ বলাকা বুক স্টল, কলেজ স্ট্রিট ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন

তবে তো বুড়িমার কোনও কাজ নেই!

নেই-ই তো। সে-কথাই তো রোজ তাকে বলে যায় ল্যাজঝোলা পাখি। সে থাকে ওই বাঁশবনে। পুবকোণে যে তলতাবাঁশের ঝাড়, তারই ডগায় তার বাসা। সকাল হলেই ডানা বিছিয়ে সে উড়ে বেড়ায় এদিক-ওদিক, এ-দেশ সে-দেশ। এ-সব খবর তাই সব তার জানা। কতদিন সে বলেছে, 'বুড়িমা, তোমার আর কাজ নেই। এবার তুমি ঘুমোও।'

বুড়িমা তবু শোনে নাকি! মন তার মানে না। ঘুম কী, সে জানে না। ঠায় বসে থাকে রাত জেগে।

আজ তখন সন্ধে হব-হব, ল্যাজঝোলা এসে বলল, 'বুড়িমা, বিপদ, খুব বিপদ।'

সেই মাত্তর পিদিম জ্বেলে বুড়িমা বসেছে। ল্যাজঝোলার কথা শুনে চমকে গেল, 'বিপদ! কার? কী হয়েছে?'

ল্যাজঝোলা বলল, 'ওইসব ভালো ছেলেদের বিপদ। ওরা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—বন্ধুরা সব এগিয়ে যাচ্ছে। সব বিষয়ে একশো পাচ্ছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওকেও জোরে ছুটতে হচ্ছে।'

'ওমা! তারপর?'

'ছুটতে-ছুটতে ওরা হাঁপিয়ে পড়ে। তবু মা বলে যায়, আরও জোরে। আর তখন ঘুম ভেঙে যায়। গা ভিজে যায় ঘামে। দু'-চোখে আর ঘুম নামে না। নামতে এলে একশো দুশো হাজার লক্ষ ভয় উঁকি দেয় মনে।'

বুড়িমা কিছু বলতে পারল না। শুধু চোখ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো তার গালে।

খানিক পরে ল্যাজঝোলা বলল, 'দুঃখ করে কী-আর করবে বলো! যে-কালে যা ঘটে, তা মেনে নিতে হয়। এবার তুমি ঘুমোও। মনটা তাহলে জুড়োবে তোমার।'

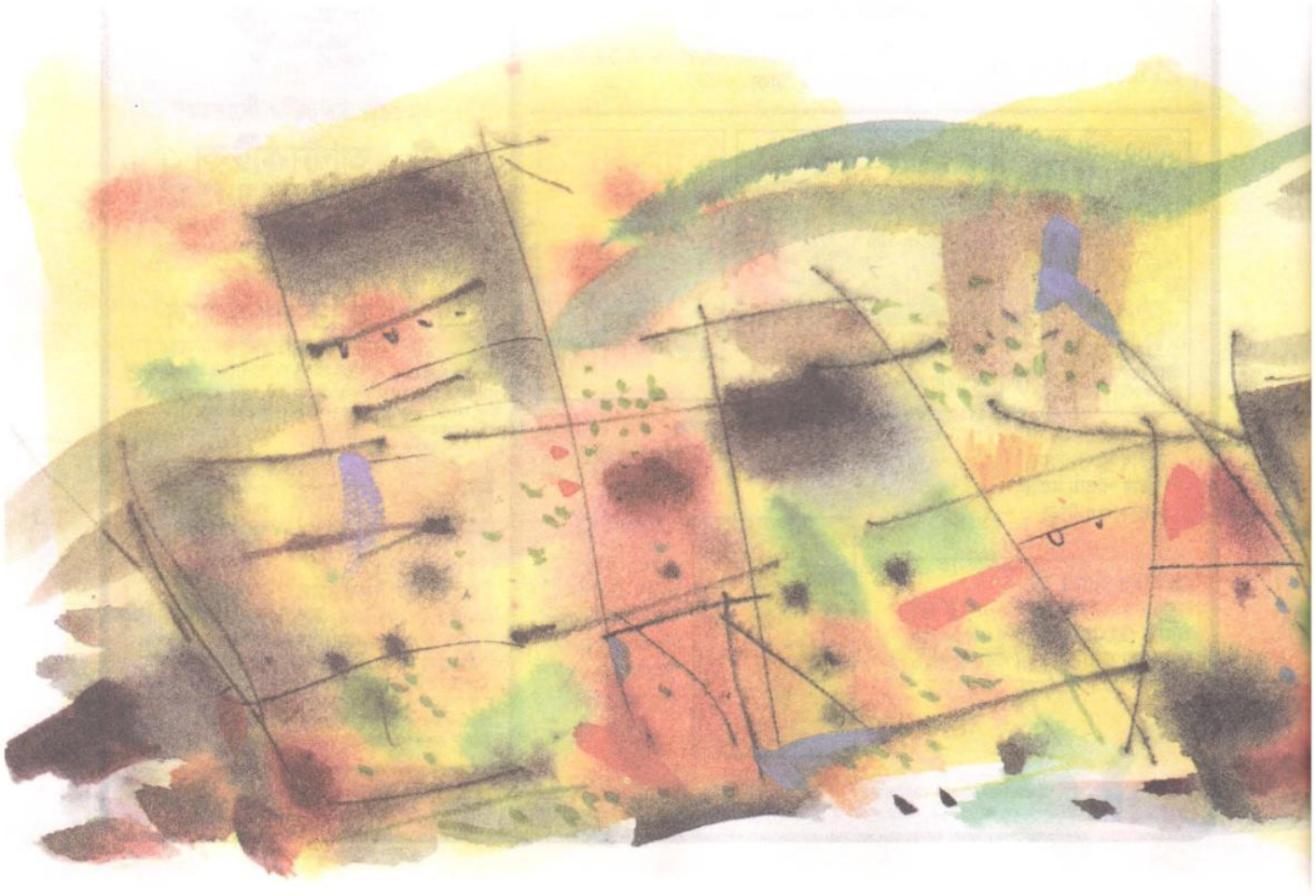

কী আর করে বুড়িমা। ল্যাজঝোলা, সে সত্য-বলা। ক্ষীরনদীর এপারে ওপারে তার কথা অমান্যি করে না কেউ। বুড়িমা তাই ঘুমোতে গেল।

তার মাদুর নেই, কাঁথা নেই। বালিশটালিশ কিচ্ছু নেই। কী করে থাকবে! আজ অব্দি কোনওদিন সে ঘুমিয়েছে নাকি! তাই মাটিতেই শুয়ে পড়ল বুড়িমা। আঁচলটা তার ঢাকা দিল গা-টিতে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। কী করে আসবে! তার দু'-চোখ যে ঘুমোতে ভুলে গেছে।

বাঁশবনের ভেতর দিয়ে দুই প্রহরের রাত চলে গেল সনসন সনসন করে। তিন প্রহর যখন যাব-যাব, বুড়িমার মনে পড়ল ঘুমপাড়ানি মাসি আর পিসিকে। উঠে বসে মন্ত্র পড়ল—

'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি, তুমি কি আমার পর?
একটি বার সামনে এসো, বাঁশতলাতে ঘর।'

তিন প্রহরের রাতে মন্ত্র তার ভেসে গেল। আর তক্ষুনি ঘরের সামনে এসে গেল ঘুমপাড়ানি মাসি আর পিসি। যেমন দেখতে ভরা-জোসনার নিশি, তারা দু'জন তেমনি ধবধবে, তেমনি ফিনফোটা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! চোখের পাতায় ছড়িয়ে যায় শীতল-শীতল ঘুম।

সব শুনে মাসি-পিসি বলল, 'তোমার চোখে আমাদের ঘুম লাগবে না।'

বুড়িমা অবাক, 'লাগবে না! কেন?'

মাসি-পিসি বলল, 'তোমার চোখ খরখরে। ঘুম দিলে ঘুম আঁচড়ে যাবে। আঁচড়ে গেলে ঘুমের গা লাল দাগে সব রেঙে যাবে। তখন ঘুম ভেঙে যাবে।'

'তাহলে উপায়?'

সংবাদ
প্রতিদিন
নিঃশব্দ বিপ্লব

'তুমি হাটে যাও। ঘুম-সদাগর ঘুম বেচে সেই চড়কডাঙার মাঠে। ঝাঁপি-ভরা তার হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম। ঘাটের ঘুম, বাটের ঘুম। তারই একটা কিনে এনে চোখে দাও।'

যা কথা। সকাল হতেই বুড়িমা চলে গেল চড়কডাঙার মাঠে। আজ হাটবার। সারা মাঠ-জুড়ে কত পসারি, কত তাদের দ্রব্য। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, খুন্তি-হাতা আর নীল-সবুজ মশারি। কিন্তু ঘুম-সদাগর কই? বুড়িমা এদিক খোঁজে, ওদিক খোঁজে। দেখতে আর পায় না। শেষে মনে মনে এক মন্ত্র ভাঁজে—

'হই রে বাবুই হই
ঘুম-সদাগর যেথায় আছে
সেথায় যেন রই।'

যেমনি বলা, অমনি বুড়িমা হুশ করে চলে এলো মাঠের একদম শেষে। পিয়ালগাছের তলায় ঘুম-সদাগর বসেছে ঝাঁপি-ভর্তি ঘুম নিয়ে! দেখে বুড়িমার আনন্দ আর ধরে না। কোন ঘুমটা নেবে? হাটের ঘুম, না মাঠের ঘুম! নাকি কিনবে ঘাটের ঘুম! ঘাটের ঘুমে জল থইথই। নাওয়ের ভিড়ে খুব হইচই। তার চে ভালো হাটের ঘুম। হাট ভাঙলে নিঝুম-ঝুম। আরও ভালো মাঠের ঘুম। ধু-ধু মাঠ, সবুজ মাঠ।

এক কৌটো হাটের ঘুম আর এক কৌটো মাঠের ঘুম কিনে বুড়িমা ফিরে এলো তার বাঁশতলার ঘরে। সন্ধে তখন নামে-নামে। বাঁশবাগানের ডাইনে-বামে অন্ধকারের ছুঁই লেগেছে।

বুড়িমা প্রথম আজ ঘুমোবে। তাই তর আর সয় না। হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম—কোন ঘুমেতে ঘুমোবে, ঠিক আর পায় না। তারপর ক্ষীরনদীর পারে হুক্কা-হুয়ারা যেই ডেকেছে, অমনি বুড়িমা দু'-হাতে দুটো কৌটো নিয়ে বলে ফেলল একটা শোলোক—

'হাটের ঘুম মাঠের ঘুম
গড়াগড়ি যায়,
চারকড়া দিয়ে কিনলুম ঘুম
আমার চোখে আয়।'

যেমনি বলা, ওমা! একী কাণ্ড! কী সব্বনাশ! দু'-হাত থেকে টপাস করে পড়ে গেল দু'-কৌটো ঘুম। পড়ে গিয়েই গড়িয়ে গেল। গড়িয়ে গিয়ে পেরিয়ে গেল উঠোন। বুড়িমা ছুটল ঘুম ধরতে।

কিন্তু ধরা অত সহজ নাকি! কৌটো তখন গড়িয়ে চলে চাকার মতো। হুশ করে পেরিয়ে গেল বাঁশবন। বুড়িমাও ছুটল তার পিছু-পিছু। পাঁইপাঁই-পাঁইপাঁই। কিন্তু কী করে পারবে বুড়িমা!

সাঁইসাঁই-সাঁইসাঁই করে তখন ছুট দিয়েছে দু'-কৌটো ঘুম। দিঙনগরের মাঠ পেরোল। তিরপূর্ণির ঘাট পেরোল। তা পেরিয়ে হট্টমালার দেশ। সে-দেশ যখন শেষ, বুড়িমা থমকে গেল।

ওমা! এ কোন রাজ্য! আকাশছোঁয়া বাড়ি—গায়ে গায়ে, লক্ষ লক্ষ। ইশুত-নিশুত রাত, আলো জ্বলছে দিনের মতো। যেন সূর্যপক্ষ। এখানে কি জোনাকপোকা, চাঁদের আলো, তারার হাসি নেই?

বুড়িমাকে ছুটতে দেখে ল্যাজঝোলা উড়ে আসছিল তার পিছু পিছু। সে এবার বলল, 'না, নেই। কী করে থাকবে? এ হল যে শহর!'

'শহর!'

দু'-কৌটো ঘুম তখন গড়িয়ে চলেছে শহরের পথ দিয়ে। এ-পথ সে-পথ। এ-গলি সে-গলি। তারপর যেই একটা বাঁক ঘুরতে গেছে, রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে পুট করে খুলে গেল কৌটো দুটোর মুখ।

খুলে যেতেই হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম ছড়িয়ে গেল শহরের বাতাসে।

কিন্তু আকাশে! কী ও? লাল, নীল, হলুদ—ঝিকমিক সব আলোর মতো! গুঁড়ি-গুঁড়ি সব জলের মতো নেমে আসছে বাতাস বেয়ে! কী ও? কী?

ল্যাজঝোলা বলল, 'স্বপ্ন।'

বুড়িমা অবাক, 'স্বপ্ন!'

'হ্যাঁ গো। আমাদের দিঙনগরের মাঠ, তিরপূর্ণির ঘাট, হট্টমালার দেশ, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর—সেখানকার সব স্বপ্ন। হাটের ঘুম, মাঠের ঘুমের হাত ধরে সব এখন নেমে আসছে ভালো ছেলেদের ঘুমের মধ্যে।'

বুড়িমার যেন বিশ্বাস হয় না। বলল, 'তাই! অমন স্বপ্ন নেমে এলে তো ছেলেরা সব দুষ্টু হয়!'

মিটিমিটি হাসল ল্যাজঝোলা পাখি। বলল, 'দুষ্টু হয়, তুষ্টু হয়, শরীরে-মনে পুষ্টু হয়।'

বুড়িমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল। বলল, 'চল তবে, আমরা এবার ফিরে যাই। কতদিন ওরা ভালো করে ঘুমোয়নি। এবার একটু শান্তি করে ঘুমোক।'

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

আবোল তাবোল
৩৫.০০
হ য ব র ল
৪০.০০

কলিকাতা দর্পণ ২
১৬০.০০

চীনামাটি
৮০.০০

নোংরা হাত
ভাষান্তর : শিবনারায়ণ রায়
৬০.০০

মস্তক বিনিময়
ভাষান্তর : ক্ষিতীশ রায়
৪০.০০

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৭০০০০৯
ফোন ২২৪১৮০৯১
ই-মেল soyoument@hotmail.com
ওয়েবসাইট www.subarnarekha.com

বাংলা ভাষার প্রথম দু'টি রান্নার বই

প্রসঙ্গ কথা ও পরিভাষা : শ্রীপান্থ
২৫০.০০

জলসাঘর
৮০.০০

স্মৃতিকথা
স্মৃতি-বিস্মৃতি
৮০.০০

সম্পাদিত
বেড়াল নিয়ে অনবদ্য
গল্প সংকলন
যত কাণ্ড ম্যাও মিউ
৮০.০০

বিদুর ৮০.০০

সম্পাদিত
উপেন্দ্রকিশোরের
টুনটুনির বই
৬০.০০

শারদীয় প্রতিযোগিতার ফলাফল

কী সাংঘাতিক কাণ্ড! ১৪১২-র শারদীয় 'সন্দেশ' যেমন তোমরা পড়েছ হৈহৈ করে, শারদীয় প্রতিযোগিতার উত্তরও এসেছে টগবগিয়ে! তাড়া-তাড়া উত্তরপত্র, দুই সম্পাদক মিলেমিশে রাত-জেগে পড়ে-পড়ে হয়রান! সবচেয়ে ভালো কী জানো? 'লাগল কেমন প্রতিযোগিতা'র প্রতিটা লেখাতেই তোমাদের প্রাণের পরশ আছে। যদি কোনও লেখা ভালো না-লেগে থাকে, সেটা জানাতেও কসুর করোনি। খুব মিষ্টি লাগল যখন দেখলাম—এতগুলো উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাছে হাঁপিয়ে ওঠো, প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেরি হয়ে যায়—এই ভয়ে খুদেরা দু'-একটা উপন্যাস পড়েই প্রতিযোগিতার লেখা পাঠিয়ে দিয়েছ। তার মানে, শারদীয় 'সন্দেশ' এতটাই বড়—পড়ে-পড়েও ফুরোবার নয়। কিন্তু ইয়ে কী বলে...

'বই চেনো প্রতিযোগিতা'র ১০টা উত্তরই ঠিক—দু'-বিভাগেই মোটে একটা করে! আর 'লাগল কেমন প্রতিযোগিতা'র ক-বিভাগে একটার বেশি পুরস্কার দেওয়া গেল না।

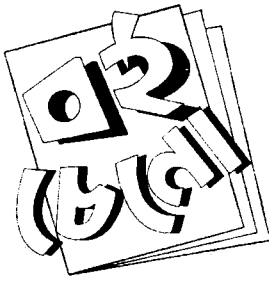

প্রতিযোগিতার উত্তর

(১) হলদে পাখির পালক। লীলা মজুমদার
(২) সে (গেছোবাবা)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) মুঙ্গু। অজেয় রায়
(৪) স্ট্রাইকার। মতি নন্দী
(৫) এক ডজন গপ্‌পো (ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি)। সত্যজিৎ রায়
(৬) ঠাকুরমার ঝুলি (লালকমল নীলকমল)। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
(৭) মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র (কাকে-পেঁচায়)। গৌরী ধর্মপাল
(৮) আধ ছটাক ভূত (গন্ধটা খুব সন্দেহজনক)। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
(৯) পথের পাঁচালী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১০) টুনটুনির বই (নরহরি দাস)। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ক-বিভাগ (যাদের বয়স ১৭ বছরের কম)

প্র থ ম অপরাজিত চক্রবর্তী। নবম শ্রেণী, চক্রবেড়িয়া হাইস্কুল (১০টা ঠিক)
দ্বি তী য় অরুণিমা সেনগুপ্ত। দশম শ্রেণী, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয় (৭টা ঠিক)
তৃ তী য় সাত্যকি দত্ত। সপ্তম শ্রেণী, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬টা ঠিক)

খ-বিভাগ (১৭ থেকে সব্বাই)

প্র থ ম বিপাশা ভট্টাচার্য। কলকাতা ৭০০০৫০ (১০টা ঠিক)
দ্বি তী য় সংঘমিত্রা কর। কলকাতা ৭০০০৬১ (৮টা ঠিক)
তৃ তী য় অতনু কুমার। চুঁচুড়া, হুগলি (৭টা ঠিক)

লাগল কেমন প্রতিযোগিতা

ক-বিভাগ (যাদের বয়স ১২ বছরের কম)

প্র থ ম উর্বী চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় শ্রেণী, কারমেল কনভেন্ট হাইস্কুল, দুর্গাপুর

খ-বিভাগ (১২ বা তার বেশি, কিন্তু ১৭-র কম)

প্র থ ম সোমনাথ দাস। বয়স ১৪, সাত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন

দ্বি তী য় অরিন্দম ঘোষ। নবম শ্রেণী, শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়

তৃ তী য় দেবাদৃতা দত্ত। একাদশ শ্রেণী, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ

পুরস্কার-পাওয়া লেখা

আমি 'সন্দেশ'-এর একজন নিয়মিত এবং আগ্রহী পাঠিকা। এবারের শারদীয় সংখ্যার অনেকটাই পড়া হয়ে গেছে। বাবা-মার মনে হয়েছে ছেলেবেলার একঝলক তাজা হাওয়া যেন মনের মধ্যে বয়ে গেল! দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে 'সন্দেশ'—রেখে দেওয়ার মতো। সে যাক-গে, এখন গল্পগুলোর কথা বলি। আমি ছ'টা গল্প আর সাতটা কবিতা পড়েছি। গল্পগুলোর মধ্যে একটা উপন্যাসও পড়েছি। সেটা হলো অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা 'এবু গোগো'। খুব ভালো গল্প, কিন্তু শেষেরদিকে আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। আমার মনে হয় যে, গল্পের শেষটা অত দুঃখের না-করলেও চলত। পরের গল্পটা হলো শৈলেন ঘোষের লেখা 'অদ্ভুত সেই ঘোড়ার গল্প'। গল্পটাতে কোনও খুঁত নেই, তাই এটাকে নিয়ে আমার কিছু বলবারও নেই। এরপর আমি চলে যাচ্ছি আমার পড়া তৃতীয় গল্প শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'গোকুলবাবু'তে। গল্পটা খুব-একটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ওটায় আর-একটু চঞ্চলতা আনা উচিত ছিল। বাকি তিনটে গল্প সম্বন্ধে আমি যদি লিখতে যাই তো সকাল হয়ে যাবে।

তাই এবার আমি আমার পড়া সাতটা কবিতার মধ্যে যে-কোনও তিনটের কথা লিখব। প্রথমেই আমি লিখব অপূর্ব দত্তর লেখা 'আবার ক্রিকেট'। আচ্ছা, পেনোবাবু কার কাছে কবিতাটা বলছেন, সেটাই তো লেখেননি! পরেরবার লেখার সময় সেটা লিখে দিতে বলবেন ওনাকে। পরের কবিতাটা হলো মৃদুল দাশগুপ্তর লেখা 'আমাদের গ্রাম'। আমার অবাক লাগছে এটা ভেবে যে, কয়েক বছরের মধ্যে কী করে একটা গ্রাম একটা শহরে পরিণত হয়! এরপর আমি চলে আসছি আমার শেষ কবিতা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'বিদ্যা-বড়ি'তে। আপনি যদি আমাকেও একটা বিদ্যা-বড়ি পাঠান, তাহলে খুব ভালো হয়।

অনেক লিখে ফেললুম। বাবা বলছে—ব্যস ব্যস, এইখানে দাঁড়ি দে।

উর্বী চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন থেকেই নাম শুনতাম 'সন্দেশ'-এর। সন্দেশ তো অনেক খেয়েছি, কিন্তু এই 'সন্দেশ' হাতে পেয়ে দেখলাম খাবারের থেকেও উৎকৃষ্ট এবং সেরা কারিগর দ্বারা প্রকাশিত। বলে রাখি, 'সন্দেশ' মাসিকপত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় এবারের বৈশাখ থেকে। প্রতিটা সংখ্যার মতো 'সন্দেশ'-এর শারদীয় সংখ্যা পেয়েও খুব খুশি হলাম।

তখনও পুজোর ছুটি পড়তে দু'দিন বাকি, ছুটির আমেজ ভাসছে, পুজোর 'সন্দেশ' স্কুলে নিয়ে গেলাম। ক্লাসে বার করতেই একটা ছোটখাটো দাঙ্গা বেঁধে গেল। সবাই বলল, 'তুই 'সন্দেশ' পেয়ে গেছিস?' স্বয়ং স্যার বললেন, 'পড়া হয়ে গেলে একবার দিও।' তখন নিজেকে খুব গর্বিত মনে হচ্ছিল—এমন একটি সংগ্রহ আমার কাছে আছে।

শারদীয় 'সন্দেশ'-এর স্বাদ এককথায় অনবদ্য। বিশেষ করে উপন্যাস ও বড়গল্প প্রচণ্ড ভালো লেগেছে। উপন্যাসের মধ্যে 'এবু গোগো' আর 'অন্ধের নিশানা' পড়ে মন ভরে গেছে। 'এবু গোগো' উপন্যাসে লেখক এবু গোগোর বিবর্তিত জীবন ও মানুষের সামাজিক জীবনের অনন্য রূপ তুলে ধরেছেন। 'অন্ধের নিশানা' উপন্যাসে অন্ধ রাজকুমারের জীবনের একাকীত্বের মধ্যে চুরমুনিয়া আনন্দ এনে দিয়েছিল। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বড়গল্প 'আলাস্কার ছবি' পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল মনের মধ্যে আঁকা কোনও আলাস্কায় পৌঁছে গেছি! শৈলেন ঘোষের বড়গল্প 'অদ্ভুত সেই ঘোড়ার গল্প'তে দুই কিশোর-কিশোরী দুঃখের মধ্যেও রোমাঞ্চকর মনের পরিচয় দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের কবিতা 'দ্যাখো রে, নয়ন মেলে'র তিনটে স্তবক খুব ভালো লেগেছে। তাছাড়া শ্রীজাতর 'নতুন রুট' ও অমিতাভ চৌধুরীর 'দশকিয়া' বেশ ভালো।

মন ভরে গেছে সুজয় সোমের 'ফালতু খাতা' ও সুবোধ ঘোষের 'খেরোর খাতা' পড়ে। সুজয় সোম শৈশব থেকেই যেভাবে বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গ পেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন ও নানান মুহূর্তে জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে, সেটা কী সুন্দর লিখেছেন! সুবোধ ঘোষের 'খেরোর খাতা' 'সন্দেশ'-এর মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। 'সন্দেশ' যেন চিরঅমর হয়ে থাকে।

সোমনাথ দাস

রান্নাবান্না

রাজশ্রী রাহা

আজ রোববার। বাবা বাড়িতে। রিম্পির ইচ্ছে হল একটা-কিছু বানাবে। রান্নাঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করছে, মা বললেন, 'যাও, শিগগিরি পড়তে যাও। সামনে পরীক্ষা।'

রিম্পি বই নিয়ে বাবার সামনে বসল। বাবা দেখলেন—সময় চলে যাচ্ছে, বইয়ের পাতা একই আছে। বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

ঠোঁট ফোলাল রিম্পি, 'শিখিয়ে দাও-না একটা-কিছু, আজ দুপুরে আমি রান্না করব।'

বাবা অমনি ঠোঁটে আঙুল দিলেন। রান্নাঘরের দিকে ইশারা করলেন। মুখে বললেন, 'চানের ঘরে গেলে।'

রিম্পি ঠোঁট-ফোলানো ভুলে, ফিক করে হেসে বইয়ে মন দিল।

বাবা আর রিম্পি এখন রান্নাঘরের সামনে। বাবার হাতে তিনটে লাল-টুকটুকে অথচ শক্ত টমেটো। মাথার ওপর বৃতিটা কী-সুন্দর সবুজ! রিম্পির সামনে তিনটে চীনেমাটির প্লেট, একটা চামচ, একটা কাচের বাটিতে চার চা-চামচ চিনি, তিনটে লঙ্কা কুচনো (বাবা করে দিয়েছেন), তিন চিমটে নুন।

বাবার কথামতো এবার একটা ছুরি দিয়ে রিম্পি তিনটে টমেটোকেই ওপর থেকে ছ'-টা সমান মাপে এমনভাবে কাটল, যাতে তলাটা জুড়ে থাকে। টমেটোর ভেতরে যা ছিল, সেটা কাচের বাটিতে রেখে, সাদা প্লেটে টমেটোগুলোকে ফুলের মতো সাজিয়ে দিল। কী সুন্দর!

কাচের বাটিতে নুন, চিনি, কাঁচালঙ্কার সঙ্গে টমেটোর রস ভালোভাবে চামচ দিয়ে মেশালো। লাল-সবুজ রঙের রস—কী লোভনীয়! এবার প্রত্যেকটা প্লেটে সাজানো ফুলের মতো টমেটোর ওপর ওই রঙিন রস ছড়িয়ে দিল।

'আহ! কী দারুণ!' লাফিয়ে উঠল রিম্পি, 'এক্ষুনি খাব।'

ঘাড় নাড়লেন বাবা, 'উঁহু। এবার ট্রে-তে সাজিয়ে রোদে দাও। পাহারা দিতে হবে, সামনে বসে পড়ো। একেই বলে টমেটোর কাঁচা চাটনি।'

এক ঘণ্টা পরে খাওয়ার সময়। মা বললেন, 'ভারী সুন্দর তো! এটা কী?'

বাবা চুপ, রিম্পিও। দু'জনের মুখেই দুষ্টু হাসি।

আঙুল দিয়ে তুলে একটুখানি মুখে দিয়েই মা বললেন, 'বাঃ! রিম্পি ছাড়া এমন রান্না কে রাঁধবে!'

রিম্পি আধঘণ্টার বদলে দশ মিনিটে খাওয়া শেষ করল।

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম
অলঙ্করণ : সমীর সরকার

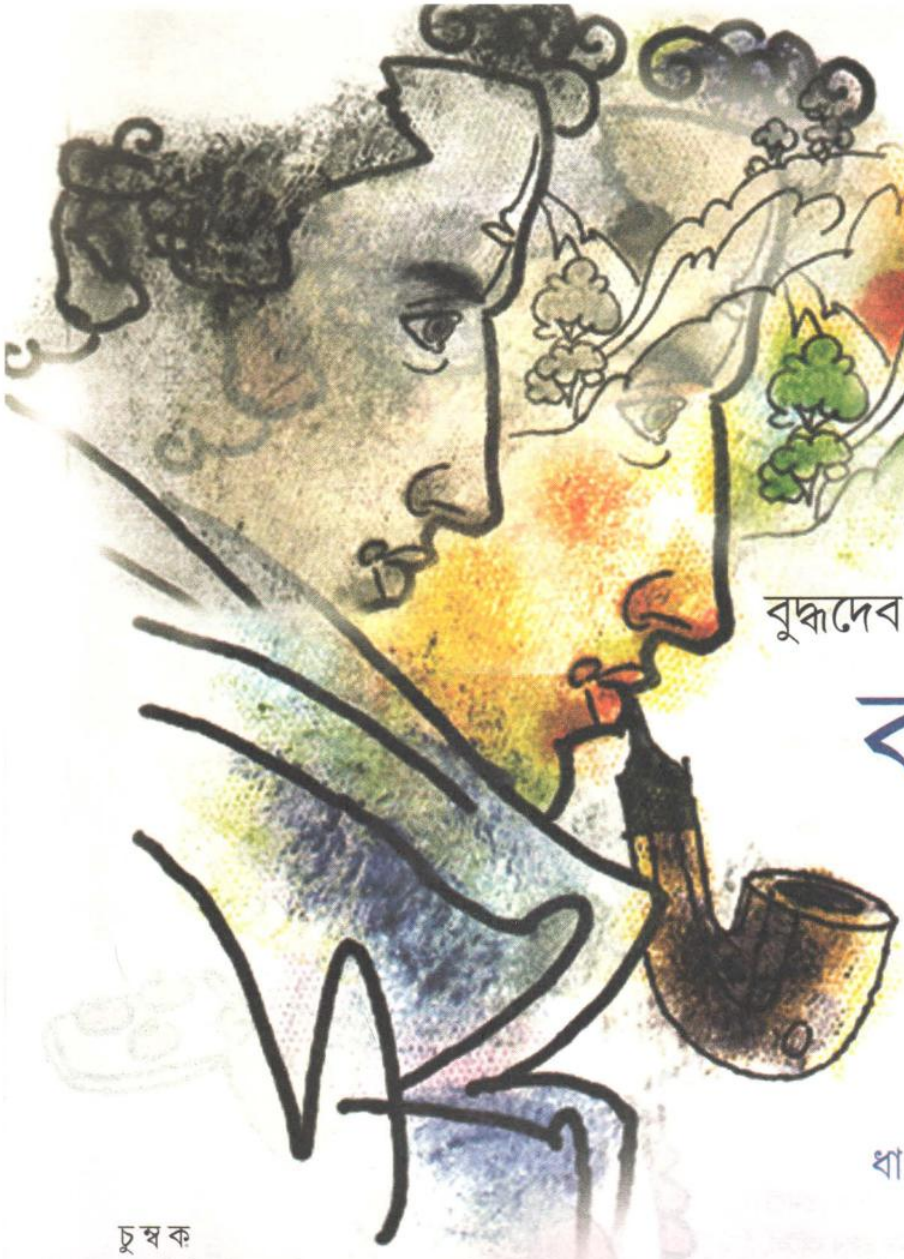

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

বুদ্ধদেব গুহ

ফোটা কার্তুজের গন্ধ

ধা রা বা হি ক ঋজুদা-উপন্যাস

চু ম্ব ক

মহারাষ্ট্রের মেলঘাট বাঘ-প্রকল্পের চিখলডারায় বেড়াতে গেছে ঋজুদা, ভটকাই আর রুদ্র। ভরা-শীতের সন্ধেবেলায় আড্ডা, কবিতার আসর আর গানের ম্যায়ফিল-এর মধ্যিখানে খবর এলো—পেঞ্চ টাইগার রিসার্ভ-এ দু'-দুটো বাঘ এবং তদন্তে যাওয়া দু'জন রেঞ্জারকেও মেরেছে চোরাশিকারিরা। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে ঋজুদার মতো বন-বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দাকে আমন্ত্রণ—এই হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদ করার জন্য। পরেরদিন চিখলডারার জঙ্গল দেখে, নাগপুরে রাত কাটিয়ে, তিনজনে পৌঁছল মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্কে, বন-বাংলোয়। অভয়ারণ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় পৌঁছে ঋজুদা ঠিক করল—রুদ্র সেখানে সারারাত পিস্তল-সহ রাতের জঙ্গলকে নজর করবে। শেষবিকেলে রুদ্র উঠে বসল বিজাগাছে। রাত্তিরে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই মূর্তি বিজাগাছের গুড়িতেই হেলান দিয়ে বসল। খানিক বাদে উঠে এগিয়ে গেল—গুলির আওয়াজ—চিতল হরিণের চামড়া ও দুটো রাং নিয়ে দুই মূর্তি কাঁচা রাস্তায় অপেক্ষমান জিপগাড়িতে চড়ে পালাল। চোরাশিকারের জায়গায় ১২ বোর শটগান-এর একটা ফোটা কার্তুজের প্লাস্টিকের খোল কুড়িয়ে পেল রুদ্র। দামি অ্যামেরিকান কার্তুজ। ভোরবেলা রুদ্রকে নিতে আসার সময় জঙ্গলে বড়বাঘ দেখল ঋজুদা ও ভটকাই। চোরাশিকারিরা কি কোরকুদের গ্রামে গেছে? ছদ্ম-পরিচয়ে ঋজুদারাও সেই গ্রামে যাবে ঠিক করল।

৮

বাংলোতে ফিরে আমরা যখন ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি, তখন রেঞ্জারসাহেব এসে পড়লেন। ব্রেকফাস্ট-টেবিলের সামনে বসে আমাদের ম্যাপটাকে তার ওপর বিছিয়ে ঋজুদা তার মঁ-ব্লাঁ রোলারটা দিয়ে ছোট ছোট তারা চিহ্ন এঁকে যে-সব জায়গা ম্যাপে নেই অথচ আমাদের যে-সব জায়গা সম্বন্ধে তথ্য দরকার, সেগুলো লিখে নিচ্ছিল।

রেঞ্জারসাহেব বললেন, 'আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না বোসসাহেব। ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিয়ে, তারপরই না-হয় বারান্দায় বসে এই কাজটি সারা যাবে।'

আমিও বললাম, 'তাই ভালো হবে ঋজুদা। খেয়েই নাও।'

ভটকাই-এর করুণ মুখের দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ব্রেকফাস্ট ওই নামেই! গরম দুধে কর্নফ্লেক্স (ও সবসময়ই বলে, 'এর চেয়ে মুড়ি বা খই ভালো।' ঋজুদাও তাই বলে।), দড়কচা-মারা আপেল, দুটো করে কেলে হয়ে-যাওয়া কলা, আর দুটো করে কলাই ডালের বড়া। সঙ্গে অবশ্য সম্বর আর রসমও ছিল। আমার তো ভালোই লাগছিল। ভটকাইটা ঋজুদার প্রশ্রয়ে দিনকে-দিন বড়ই চালিয়াত হয়ে যাচ্ছে! বাড়িতে হয়তো চিঁড়ে-গুড় বা চিঁড়েভাজা খায়, বেশি হলে হালুয়া। কিন্তু এখানে এসে হ্যাম, সসেজ, বেকন, মাসটার্ড, ব্রাউন বা গার্লিক-ব্রেড ছাড়া চলে না। সঙ্গে দুধ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফ্যাটানো দুটো ডিমের কুসুমের সঙ্গে টোম্যাটো ও শশার কুচি, পাওয়া গেলে চিনেবাদাম বা কড়াইশুঁটি, থাকলে কিসমিস ফেলে দিয়ে হয় ওমলেট, নয় স্ক্রাম্বলড এগস তার চাই-ই।

. তবে খাদ্য যে-রকমই হোক, চা-টা খুবই ভালো। ঋজুদা আর তিতির দার্জিলিং-চায়ের ভক্ত। পাতলা, সুগন্ধী লিকারের . মকাইবাড়ি অথবা অন্য কোনও বাগানের। আর ভটকাই-এর পছন্দ আসামের চা। গাঢ় রঙের স্ট্রং লিকারের।

তিতিরের কথাটা যখন চায়ের প্রসঙ্গে মনে এলো, ঠিক তখনই বাংলোর বাইরে একটা জিপের আওয়াজ শোনা গেল। রেঞ্জারসাহেব চেয়ার পেছনে ঠেলে, দাঁড়িয়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে তিতিরের সঙ্গের ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করলেন। ভদ্রলোককে ফটাস শব্দ করে জুতো ঠুকে স্যালুটও লাগালেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ঋজুদার। বললেন, 'দেশপান্ডেসাহেব, সি সি এফ।'

সি সি এফ মানে চিফ কনসার্ভেটর অব ফরেস্ট।

তিতিরকে দেখে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

তিতির বলল, 'পরশু কলকাতা থেকে নাগপুরের ফ্লাইট ছিল না। সপ্তাহে তিনদিন আসে অ্যালায়েন্স এয়ারওয়েজ-এর প্লেন। কাল রাতে এসেছি। এসেই দেশপান্ডেসাহেবকে বলে একেবারে সাতসকালেই বেরিয়ে পড়েছি পেঞ্চ-এর উদ্দেশ্যে। তোমাদের কাছে আসার জন্য।'

সি সি এফ-কে দেখে রেঞ্জারসাহেব বেশ একটু অবাকই হয়েছিলেন। ডি এফ ও সাহেবই তিতিরকে নিয়ে আসবেন—এমনই কথা ছিল। সেই জায়গায় তাঁর তিন-ধাপ উঁচু সি সি এফ সাহেব নিজে কেন এলেন, তা ঠিক বুঝতে পারলেন না বলে মনে হল রেঞ্জারসাহেব।

তিতির এবং দেশপান্ডেসাহেবও ব্রেকফাস্ট খেতে বসলেন। ভোরে শুধু এক কাপ চা খেয়ে তিতিররা বেরিয়েছিল।

ঋজুদা পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'ইটস আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ মিস্টার দেশপান্ডে, আই মিন, ইওর ভিজিট হিয়ার।'

দেশপান্ডেসাহেব বললেন, 'সাধ করে আসিনি। প্রথমত, এই প্রেটি ইয়াং লেডিকে একা ছেড়ে দিতে চাইনি। দ্বিতীয়ত, আমার চাকরি সংশয় হয়েছে। ফরেস্ট-সেক্রেটারি গতকালই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিধানসভায় কথা উঠেছে মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যের বনবিভাগে বা পুলিশ-বিভাগে যোগ্য অফিসারের কি অভাব ছিল যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর রাজ্য থেকে একজনকে নেমন্তন্ন করে আনতে হলো! এটা মহারাষ্ট্রের পক্ষে বদনামের। পেঞ্চ টাইগার প্রজেক্ট শুধু মহারাষ্ট্রেরও নয়, মধ্যপ্রদেশের মালিকানাও আছে এতে।'

ঋজুদা পাইপ ধরাতে ধরাতে মৃদু হাসছিল। পাইপটা ধরিয়ে নেবার পরে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী!' দেশপান্ডেসাহেব বললেন, 'আমাদের ফরেস্ট-সেক্রেটারি পণ্ডিত মানুষ—শুধু প্রাণীতত্ত্বই নয়, কাব্য সাহিত্য সংগীত সব ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ, পাণ্ডিত্যও আছে। সেই ভরসাতেই বললাম, স্যার, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একবার আয়কর বিভাগ থেকে একটা চিঠি পেয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, তুমি পৃথিবীর সেরা গণিতজ্ঞ, ইনকাম ট্যাক্সের একটা সামান্য ফর্ম ভরতে ভয় পাচ্ছ? তখন আইনস্টাইন তাঁকে বলেছিলেন, ইনকাম ট্যাক্স! মাই গুডনেস! আ ম্যাথেমেটিসিয়ান ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, ইট রিকুয়ার্স আ ফিলসফার!... তো আমিও সেক্রেটারিসাহেবকে বললাম, আমাদের দিয়ে হলে ঋজু বোসকে ডাকতাম না স্যার। ওঁর অভিজ্ঞতা এত ব্যাপ্ত, আর ওঁর তিন অল্পবয়সি চ্যালাও যেমন করিৎকর্মা, পারলে উনিই পারবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পারবেন। আমরা তো সঙ্গে থাকবই।'

ঋজুদা বলল, 'ইটস ভেরি নাইস অব ইউ ইনডিড। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। আমার চ্যালারাও সবসময়েই সাহায্য করেছে। এরা তিনজনেই অত্যন্ত দক্ষ—বয়স কম

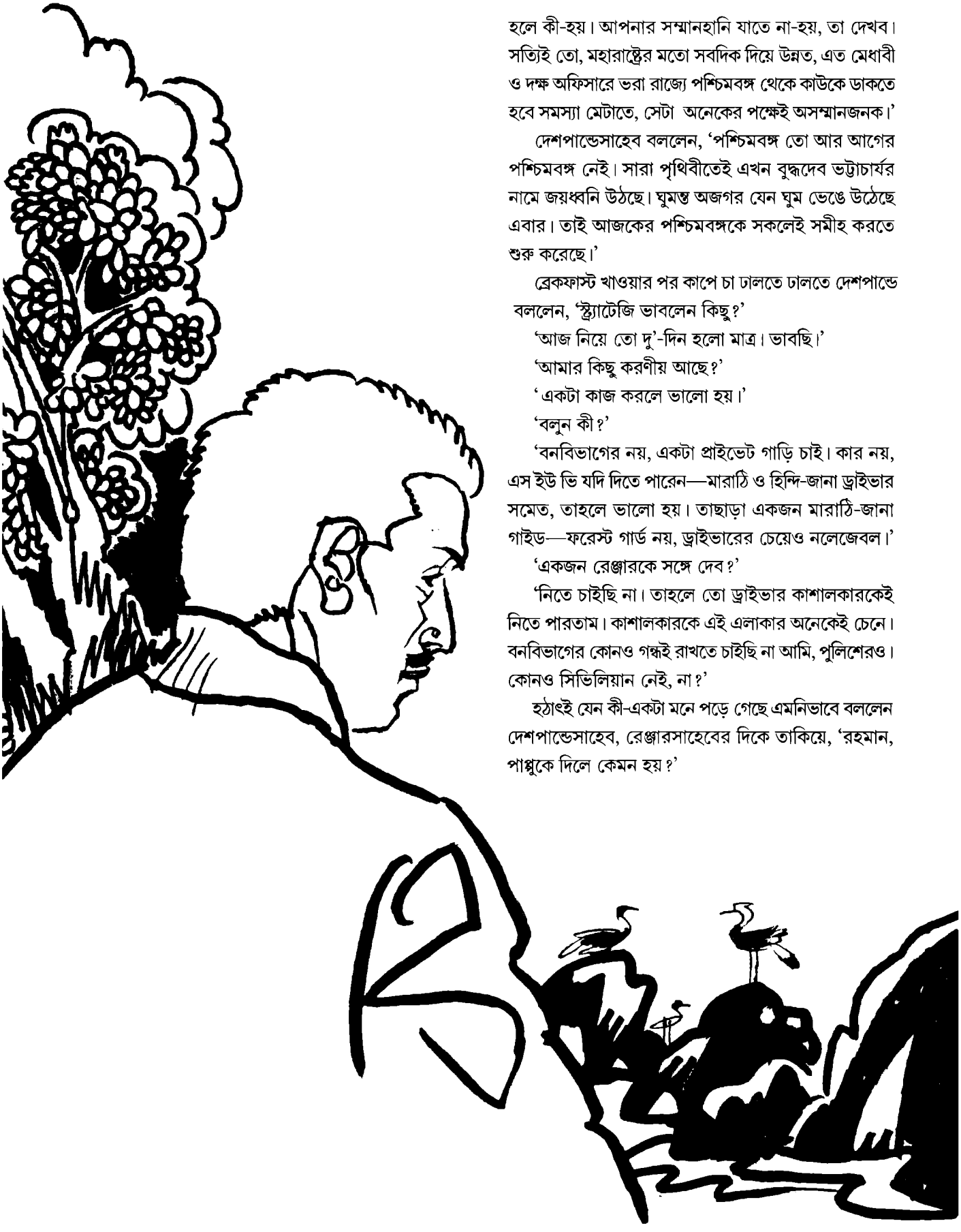

হলে কী-হয়। আপনার সম্মানহানি যাতে না-হয়, তা দেখব। সত্যিই তো, মহারাষ্ট্রের মতো সবদিক দিয়ে উন্নত, এত মেধাবী ও দক্ষ অফিসারে ভরা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাউকে ডাকতে হবে সমস্যা মেটাতে, সেটা অনেকের পক্ষেই অসম্মানজনক।'

দেশপান্ডেসাহেব বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গ তো আর আগের পশ্চিমবঙ্গ নেই। সারা পৃথিবীতেই এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নামে জয়ধ্বনি উঠছে। ঘুমন্ত অজগর যেন ঘুম ভেঙে উঠেছে এবার। তাই আজকের পশ্চিমবঙ্গকে সকলেই সমীহ করতে শুরু করেছে।'

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কাপে চা ঢালতে ঢালতে দেশপান্ডে বললেন, 'স্ট্র্যাটেজি ভাবলেন কিছু?'

'আজ নিয়ে তো দু'-দিন হলো মাত্র। ভাবছি।'

'আমার কিছু করণীয় আছে?'

'একটা কাজ করলে ভালো হয়।'

'বলুন কী?'

'বনবিভাগের নয়, একটা প্রাইভেট গাড়ি চাই। কার নয়, এস ইউ ভি যদি দিতে পারেন—মারাঠি ও হিন্দি-জানা ড্রাইভার সমেত, তাহলে ভালো হয়। তাছাড়া একজন মারাঠি-জানা গাইড—ফরেস্ট গার্ড নয়, ড্রাইভারের চেয়েও নলেজেবল।'

'একজন রেঞ্জারকে সঙ্গে দেব?'

'নিতে চাইছি না। তাহলে তো ড্রাইভার কাশালকারকেই নিতে পারতাম। কাশালকারকে এই এলাকার অনেকেই চেনে। বনবিভাগের কোনও গন্ধই রাখতে চাইছি না আমি, পুলিশেরও। কোনও সিভিলিয়ান নেই, না?'

হঠাৎই যেন কী-একটা মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে বললেন দেশপান্ডেসাহেব, রেঞ্জারসাহেবের দিকে তাকিয়ে, 'রহমান, পাপ্পুকে দিলে কেমন হয়?'

'কোন পাপ্পু স্যার?'

'আরে, পাপ্পু সাডোলিকার।'

রেঞ্জার রহমানসাহেবের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। বললেন, 'আইডিয়াল হবে স্যার।'

দেশপান্ডেসাহেব আসার পর থেকেই রেঞ্জার রহমানসাহেব অ্যাটেনসনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেনাবাহিনী ও পুলিশেরই মতো বনবিভাগের আমলাদের মধ্যেও এ-সব রীতিনীতি আছে। আমাদের মতো বাইরের লোকেদের চোখে একটু বিসদৃশ লাগলেও, এই হচ্ছে আদব। অর্থাৎ, অভ্যেস।

দেশপান্ডে বললেন, 'আজই বিকেলের মধ্যে আপনার জন্যে ড্রাইভার-সমেত স্করপিঁও গাড়ি আর পাপ্পুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার প্ল্যান ঠিক করুন।'

'খুব সম্ভব আমরা কালকেই পেঞ্চ ছেড়ে চলে যাব। আজ রাতের মধ্যেই গাড়ি এবং ওদের পাঠালে ভালো হয়।'

বলেই ঋজুদা আবার বলল, 'গতরাতে আমার এই চ্যালা জঙ্গলে ছিল, গাছের ওপরে স্কাউট হিসেবে। রাতে কিন্তু পোচিং হয়েছে। চোরাশিকার।'

'তাই? কী পোচিং হয়েছে?'

'একটা চিতল স্ট্যাগ। আর আজ সকালেই আমরা পথের ওপরে বাঘ দেখেছি।'

'কোথায়?'

'ওই মাচ্ছিমারদের ক্যাম্পের দিকে যে-পথ গেছে, সেই পথে। একেবারে প্রথম সকালে। সূর্য তখনও ওঠেনি। পুবের আকাশ লাল হয়েছিল সবে।'

তারপরেই বলল, 'আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ড্রাইভার কাশালকার সব জানে। খুবই কাজের ছেলে। ওকেই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কিন্তু ও-যে বনবিভাগের ড্রাইভার, তা তো এই পুরো অঞ্চলে সকলেই জানে।'

'তা জানে।' দেশপাণ্ডেসাহেব বললেন।

তারপর উঠে পড়ে বললেন, 'আর কিছু পাঠাব? টর্চ, ব্যাটারি? খাবারদাবার? টেপ-রেকর্ডার? ক্যামেরা?'

'না-না। সে-সবই আছে আমাদের কাছে।'

'স্মল আমর্সও আছে। কোনও চিন্তা করবেন না।'

'তাহলে আর-কিছুই দরকার নেই?'

ভটকাই ফস্ করে বলে উঠল, 'কিছু ড্রাই-ফ্রুটস আর মাঠরি, অথবা কাজু পাঠাতে পারেন, চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।'

আমাদের কান লজ্জাতে লাল হয়ে গেল। ঋজুদাও অপ্রতিভ হয়ে তাকাল একবার ভটকাই-এর দিকে।

ভটকাই যেন চিরতার রস খেয়েছে এমন মুখ করে গলা নামিয়ে পুব বাংলার ভাষায় বলল, 'কী আর করন যাইব? ইখানে যি খাদ্য-খাদকের বড়ই অভাব!'

পেঞ্চ নদীর একটা অববাহিকার পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা মন্দির আছে। হনুমান মন্দির। এই জঙ্গলের মধ্যেও প্রতি মঙ্গলবারে অনেক পুণ্যার্থী আসেন নাগপুর ও আশপাশের নানা জনপদ থেকে। গাড়ি করেই আসেন। কাশালকারের সঙ্গে কথা বলে ঋজুদা ঠিকই করে রেখেছিল—আজ দুপুরে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ওই মন্দির আর তার চারধারের জঙ্গল দেখতে যাবে। এখন নাকি নদীটা প্রায় শুকনো। একটি শীর্ণধারাতে জল বইছে। বিকেলে সরেজমিনে দেখা যাবে। দুটো বাঘের একটাকে ওই অঞ্চলেই মারা হয়েছিল।

ভাগ্যিস আজ মঙ্গলবার নয়। তাই নাগপুর এবং কাছাকাছি অন্য জনপদ থেকে পুণ্যার্থীরা কেউই আসবেন না। মারুতিই যে পবনপুত্রের নাম, এ-তথ্য আগে আমাদের জানা ছিল না। ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী-তাড়োবাতে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা মারুতি মন্দির দেখতে পাই আমরা বনবিভাগের পথের ওপরে। তখনই পরম ইনকুইজিটিভ ভটকাই-এর প্রশ্নের উত্তরে ঋজুদা আমাদের এই তথ্য জানায়।

ভটকাই বলেছিল, 'আমি যখন রোজগার করব, বড় চাকরি করব, বহুত টাকার মালিক হব, তখন যে-গাড়িই কিনি না কেন, মারুতি কিনব না।'

তাতে আমি বলেছিলাম, 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল!'

স্কটল্যান্ডের ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে মহারাষ্ট্রের এই গরম জঙ্গলে এসে তিতিরের একটু-যে অসুবিধে হচ্ছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। ওর ফর্সা মুখটা তেতে লাল হয়ে গেছে। আমরা সকলেই, কাশালকারও, শুকনো নদীর পাথর-ভরা বুকে দু'-পাশেই অনেক দুর হেঁটে গেলাম। নদীর বালিতে নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম। বিশেষ করে জলের পাশে। শম্বর, নীলগাই, গাউর (অর্থাৎ ভারতীয় বাইসন), চিতল, কোটরা, চিতা, ভাল্লুক। ভিজে বালির ওপরে নানা পাখি ও সাপের চিহ্ন। ঋজুদাই শিখিয়েছিল—যে-সাপেরা এঁকেবেঁকে চলে, তারা বিষাক্ত। আর যারা সোজা চলে, তারা নির্বীষ।

একটা বেলগাছের ওপরে একটা মাচা বাঁধা দেখলাম। দেখে মনে হল মাচাটা বেশ পুরনো। কাশালকার বলে উঠল, 'এটা বনবিভাগই বানিয়েছিল। চোরাশিকারিদের ওপর নজর রাখার জন্যে। বাঘ যখন জোড়ে না-থাকে, তখন তো একাই থাকে। একের এলাকাতে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ করলেই যুদ্ধ অনিবার্য। সে-যুদ্ধ কখনও কখনও সারা দিনরাত্রি ধরে চলে। তখন বাঘের হুঙ্কারে প্রলয় উপস্থিত হয়। এ-রকম যুদ্ধ বড়বাঘ ও ভাল্লুকের মধ্যেও হয়। কাছাকাছি যদি মানুষের বসতি থাকে, তারা সারারাত জাগে ভয়ে কাঁটা হয়ে।

'এই মাচা থেকে কোনও চোরাশিকারির মোকাবিলা করা গেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম কাশালকারকে।

'না। এ-বাঘটা মারার পরে ওরা হুঁশিয়ার হয়ে গেছিল। অনেকদিন এদিকে ওদের পা পড়েনি। বাঘটা মারার মাসখানেক পরে অন্য অঞ্চলে—এখান থেকে মাইল তিরিশেক দুরে—অন্য বাঘটা মারে।'

'একজনই কি মেরেছিল?' তিতির শুধোল।

'তা কী করে বলব মেমসাহেব। বনবিভাগের বড় বড় সাহেবরাই যা জানে না, তা আমি কী করে জানব!'

অনেকক্ষণ জঙ্গলে এবং শুকনো নদীর পাথর-ভরা বুকে ঘোরাফেরা করে, অন্ধকার হওয়ার মুখে আমরা নদী ও তার পাশের মন্দিরের এলাকা ছেড়ে কিছুটা হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলাম। ফেরার পথে রাত নামল। পথে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একদল নীলগাই এবং একটা অতিকায়, প্রায় স্থবির শিঙাল শম্বর দেখলাম—গায়ের লোমগুলো সব পড়ে গেছে। হরিণ শম্বরদের বয়স হলে, গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি বা কালো হয়ে যায়। সুন্দরবনেও দেখেছি বড় ও বুড়ো চিতল হরিণের রঙ আর হলুদ থাকে না, কালো হয়ে যায়। তবে গায়ের সব চুল পড়ে যাওয়া শম্বর এর আগে কোনও জঙ্গলেই দেখিনি!

আমরা যখন পেঞ্চ বাংলোতে ফিরে বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছি—চা না-খেয়েই বেরিয়েছিলাম শেষদুপুরে আমরা—তখন নাগপুর থেকে ড্রাইভার সমেত স্করপিঁও গাড়ি নিয়ে পাপ্পু সাডোলিকার নামে এক ভদ্রলোক এলেন। খুব হাসিখুশি, দেখতেও হ্যান্ডসাম। হিন্দি, মারাঠি ও ইংরেজিতে তো সড়গড়ই, বাংলাও নাকি জানেন একটু-একটু।

'কীরকম জানেন? শোনান তো একটু।' ভটকাই বলল।

পাপ্পু বললেন, 'আমি টোমাকে ভালোবাসি।'

'আর?'

'আমার ধাঁতে খুব বেথা।'

ভটকাই বলল, 'ধাঁতে নয়, দাঁতে। আর বেথা নয়, ব্যথা।'

পাপ্পু একটু দমে গেলেন।

ঠিক হলো পরদিন আর্লি ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়ব কোরকুদের সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে। পাপ্পু এবং ড্রাইভার দু'জনকেই ম্যাপটা এগিয়ে ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, ওঁরা ওই অঞ্চলে কখনও গেছেন কিনা!

ওঁরা দু'জনেই বললেন, ওই গ্রামে কখনও নামেননি, তবে গ্রামের সামনের পথ দিয়ে বারকয়েক যাতায়াত করেছেন। ছোট গ্রাম। ওই গ্রাম থেকে ১৫-২০ মাইল দুরত্বে দু'-দিকেই বড় জনপদ আছে।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে মাছ-মাংস, আণ্ডা-মুরগি এ-সব পাওয়া যাবে তো?'

পাপ্পু বললেন, 'মাছ? কত খাবেন? গায়ে মাছের গন্ধ হয়ে যাবে। শুঁটকিমাছও পাবেন। ওই দুই জনপদের হাটে পাঁঠা ও শুয়োরের মাংসও পাবেন।'

ভটকাই বলল, 'বাহ! খাদ্য-খাদকের কোনও অভাব হবে না তাহলে! শুনলেও ভালো লাগে।'

ঋজুদা ধমক দিল। বলল, 'এরপর থেকে তোকে আর আনব না। তুই কি খাওয়া ছাড়া আর-কিছুই জানিস না?'

একটুও মুষড়ে না-পড়ে ভটকাই বলল, 'আমি তো কোয়ার্টার ফার্স্টার। খাবে তোমরা, আর গালাগালি খাব আমি!'

ঋজুদা বিরক্ত গলাতে বলল, 'সবসময় তোর এই ভাঁড়ামি সত্যিই অসহ্য।'

তিতির পাপ্পু সাডোলিকারকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কলকাতার আই টি সি-র সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে শ্রুতি সাডোলিকার গান শুনেছি। দারুণ গান করেন মহিলা।'

'উচ্চাঙ্গসংগীতের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সাডোলিকার পদবি হলেই কি আর বড় গাইয়ে হন! নো স্যার। রেডিওতে উচ্চাঙ্গসংগীত হলেই আমার বাবা বলতেন, বন্ধ করো! বন্ধ করো! কুকুরের কান্না বন্ধ করো।'

আমরা সকলেই পাপ্পুর কথায় হো-হো করে হেসে উঠলাম।

পেঞ্চ বাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম আমরা। চাঁদ উঠবে একটু পরেই। আশ্চর্য এক রহস্যময় রূপ নেবে পেঞ্চ-এর বাঁধ এবং জলাধার! যদিও জলাধারেও এখন জল সামান্যই আছে। তাই বাজে-পোড়া মরা শিমুল গাছটাকে—যে-গাছে উডডাক অথবা উডডাক-নয় পাখিকে কাল দেখেছিলাম আমরা—এখন মোহময়, না-সাদা না-কালো দেখাচ্ছে। চাঁদ উঠলেই সাদা-রঙা গাছটা রুপোঝুরি হয়ে যাবে। তবে কারু-গাম গাছদের মতো ভৌতিক সাদা হবে না।

ঋজুদাকে তিতির বলল, 'ঋজুকাকা, কোরকুদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলো না।'

'বলব। কাল তো ওদের গ্রামেই যাবি। তবে আমাদের ওখানের কাজ হয়ে গেলে আমরা আবার মেলঘাট টাইগার প্রজেক্টেও যাব। চিখলডারা হিল রিসর্টে দু'-একদিন থেকে বনের গভীরে কোরকুদের ডেরাতে চলে যাব। কনসার্ভেটর নীতীন কাক্কোডকার আর নীল মজুমদারের সঙ্গে কথাই হয়ে আছে। ওরা খুব আদর করে ডেকেছেন।'

ভটকাই বলল, 'ডিনার ক'টার সময় লাগাতে বলব? আর সব গোছগাছ করে নেব তো? কাল সকালে কখন বেরুব আমরা?'

ঋজুদা বলল, 'ডিনার সাড়ে-আটটাতে। বলে আয়। আর সাড়ে-পাঁচটায় বেড-টি। বেরোব সিক্স ও' ক্লক শার্প।'

'ঠিক আছে।' বলল ভটকাই। বলেই বলল,

'শালবন উশী নদী খান্ডুলি হিল
আয়নার মতো শুয়ে সিরসিয়া ঝিল।
লকারেতে তুলে রাখা গিরিডির স্মৃতি
ভালো মেয়ে আলো ঘোষ চোখা-চোখ নীতি।
পেঁয়াজি ও বেগুনিতে মুড়ি জমে ভালো
সাবধানে পথ চলো, ব্রাক্ষ্মণ কালো।
বোকা-খোকা আজও কাঁদে চাঁচাছোলা খাবে
কচি-কাচা কোলে-কাঁখে ঝনাদি যাবে।'

তিতির অবাক হয়ে গেল! পাপ্পু সাডোলিকার মোহিত হয়ে ভটকাই-এর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল।

ঋজুদা বলল তিতিরকে, 'কী বুঝছিস, তিতির?'

'ফ্যানটাসটিক। ভটকাই-যে এমন ছড়াকার, তা তো জানিনি কোনওদিন।'

আমি বললাম, 'কদাকার! কদাকার! আগুনে আর ঘি ঢেলো না তিতির, লঙ্কাকাণ্ড হবে।'

তিতির বলল, 'না-না, সত্যি বলছি, ইটস রিয়েলি আ ভেরি ভেরি ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! এতদিন এই গুণ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে, ভটকাই।'

'জামার হাতার মধ্যে। ম্যাজিসিয়ানরা যেমন করে পায়রা লুকিয়ে রাখে!'

ওর কথায় আমরা হেসে উঠলাম।

পাপ্পু সাডোলিকার বার বার স্বগতোক্তি করছিল, মানে না-বুঝেই, 'ভেরি নাইস, ভেরি নাইস ইনডিড।'

(ক্রমশ)

সুকান্ত সিংহ

ইচ্ছে ডানা

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

আজকে দেখছ বাসস্টপেতে, কালকে দেখবে মোড়ে
ঘরে ফিরব মায়ের তৈরি ধূপ বিক্রি করে।

তোমাকে রোজ উঠতে দেখি নীল ইশকুল বাসে
কাজের মাসি? সঙ্গে করে এগিয়ে দিতে আসে।

দরমা বেড়া, বর্ষাকালে জল ঢুকে যায় দ্বারে,
আমার দিদি তোমার মতোই চুল বাঁধতে পারে।

বাবা যাবার পরের থেকেই মা নিরামিষ, তাই—
আমি-দিদি একটা ডিমকে দু'-ভাগ করে খাই।

মা বলেছে বড় হতে, অনেক অনেক বড়—
তখন মাকে ধূপ বাঁধতে দেবো না একবারও।

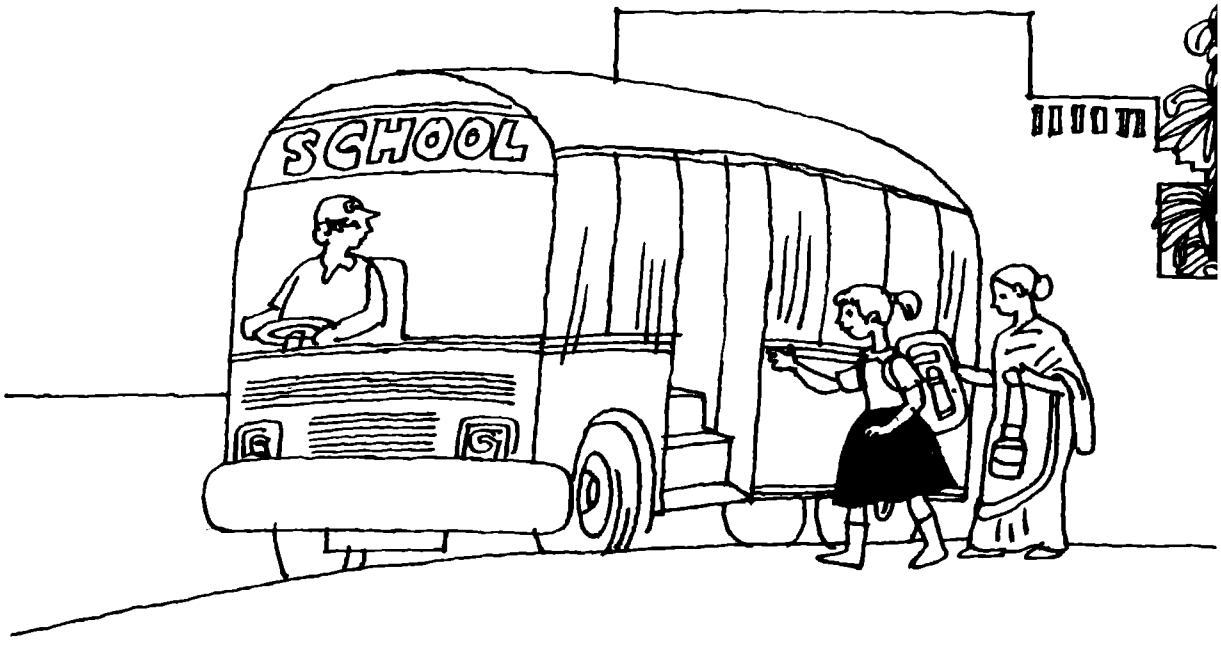

দিদির দুটো শাড়ি কিনব, সেলাই মেশিন, ফিতে,
চাদর কিনব মায়ের জন্য, জড়িয়ে নেবে শীতে।

দু'টো জুঁইয়ের চারা আছে, কিচ্ছু তো নেই আর!
রাগ করবে—তোমায় যদি একখানা দিই তার?

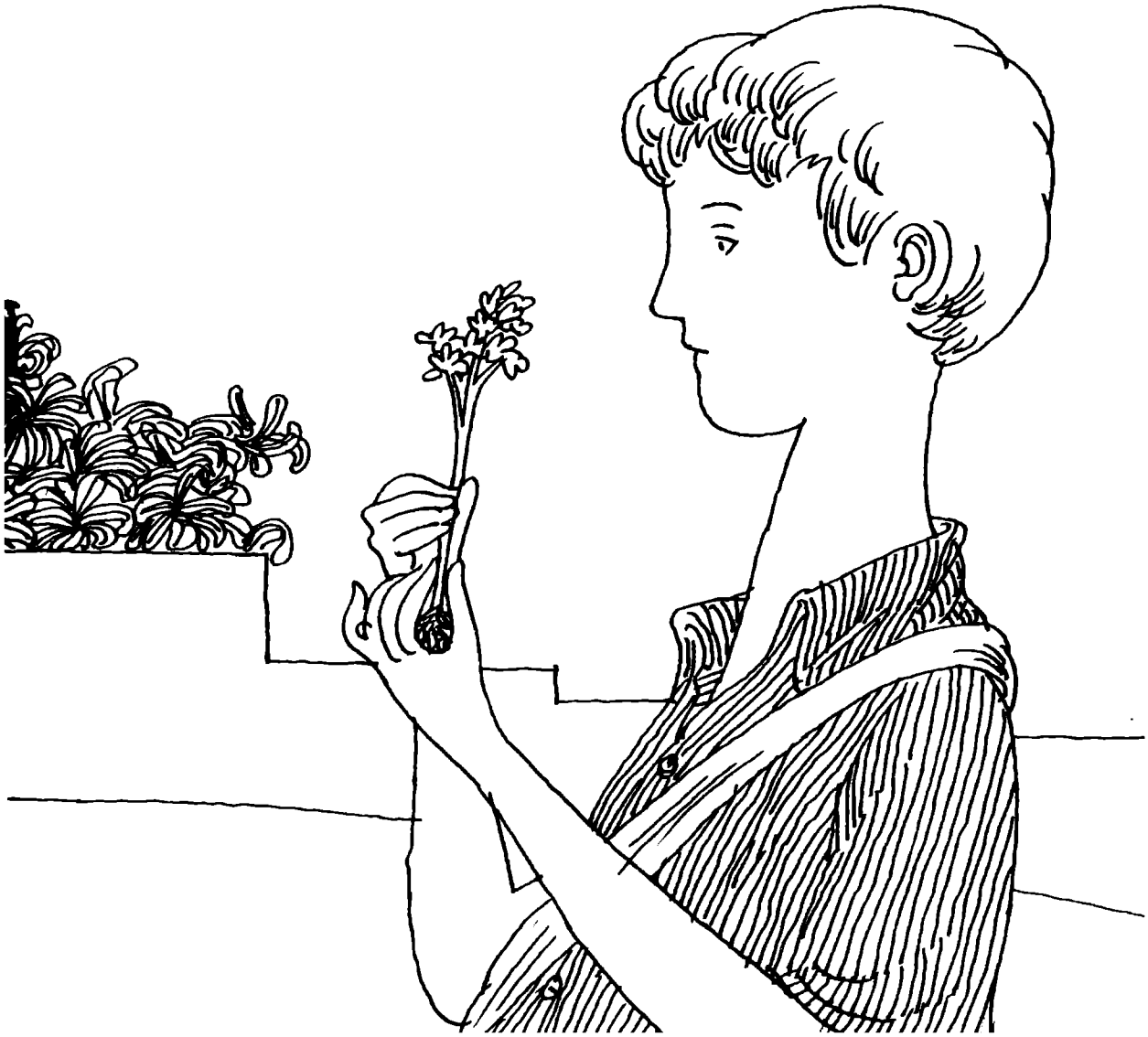

পাঁচতারা হোটেল আর বেসরকারি হাসপাতালে মধ্যে আজকাল আর বড়-একটা তফাত নেই। বিশাল আয়োজন দু'-জায়গাতেই। অবিশ্যি হাসপাতালে চলে অনেক বড় যজ্ঞ। কারণ, সেখানে রুগিদের সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। সামান্য কোনও ত্রুটি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। জানো, কারা দেখাশোনা করেন এই বিশাল কর্মকাণ্ডের? না, শুধু ডাক্তাররা নন। তাঁদের তো ব্যস্ত থাকতে হয় চিকিৎসা নিয়ে। সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্ব এখন এক নতুন শ্রেণীর পেশাদারদের ওপর, যাঁদের বলা হয় হসপিটাল ম্যানেজার। খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। যদিও অনেকেই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নামক এই পেশা সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নয়।

কাজটা ঠিক কী? এককথায় সবকিছু তদারকি করা, যাতে রুগিদের কোনও অসুবিধে না-হয়। আর ডাক্তাররা নিশ্চিন্তে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন। যেমন ধরো, হাসপাতালে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ আছে কিনা, রুগিরা ঠিকমতো খাবার পাচ্ছেন কিনা, তাঁদের চিকিৎসা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে, কিম্বা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন আছে কিনা থেকে শুরু করে যাবতীয় খুঁটিনাটি এঁরাই দেখেন। এতদিন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তাররাই এই দায়িত্ব সামলেছেন। এখন কাজের পরিধি বেড়েছে, আর তার সঙ্গে বেড়েছে জটিলতা। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা অনেক বেশি যন্ত্র-নির্ভর। একটা আধুনিক হাসপাতাল হয়ে উঠেছে যেন একটা কারখানা। ডাক্তাররা যার প্রধান কারিগর, কিন্তু একমাত্র কারিগর নন।

যে-কোনও বড় হাসপাতালেই এখন হসপিটাল ম্যানেজারদের রমরমা। তাঁরাই হয়ে উঠেছেন সূত্রধর, এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগের মধ্যে। কাজটা জটিল নয়, কিন্তু তোমায় সজাগ থাকতে হবে সবসময়। হতে হবে চৌকস, যাতে কোনও বড় সমস্যার সমাধান করতে পারো চট করে। যেমন ধরো, হঠাৎ একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে, আর তার জন্য অপারেশন আটকে আছে। কী বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে, তা অবিলম্বে ঠিক করতে হবে ডাক্তার এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে। অথবা ওষুধ শেষ হয়ে গেছে, কি কোনও রুগি অভিযোগ করছেন তাঁর চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে না। অর্থাৎ, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ!

ভয় পাবার কিছু নেই। শেখার ব্যবস্থা রয়েছে বেশ-কিছু জায়গায়। যেমন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্যোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই আর হায়দরাবাদে কোর্স পরিচালনা

নামাঙ্কন : দেবব্রত ঘোষ

কেরিয়ার গাইড

জয় মিত্র

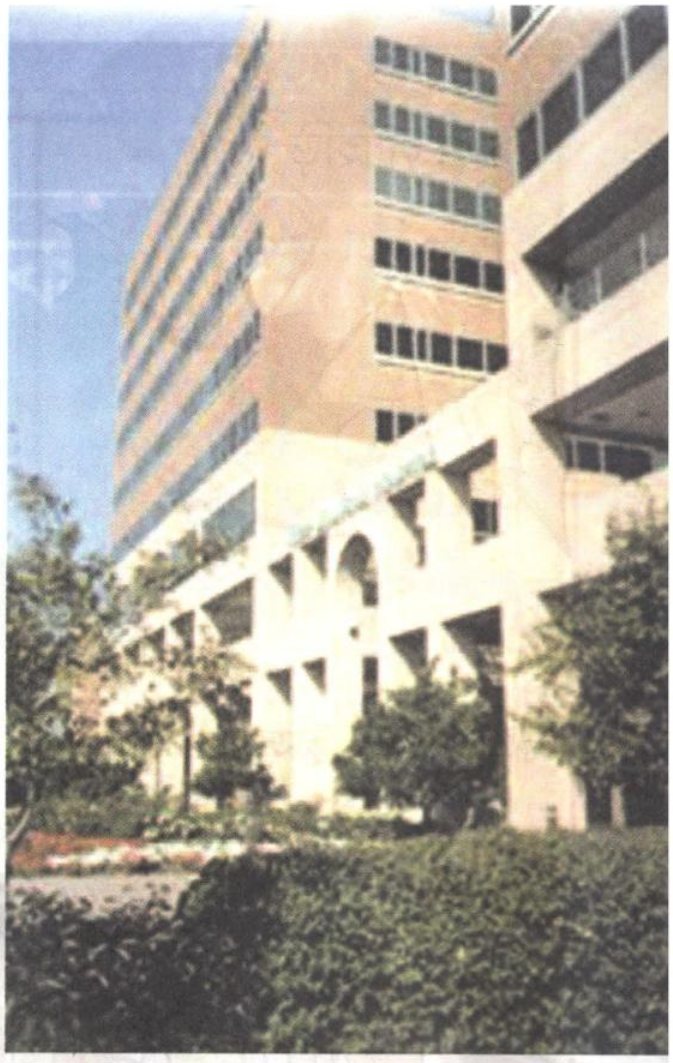

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

করে থাকে আরও একটি। এছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটা কলেজ এবং সংস্থা। দারুণ ভালো ছাত্র না-হয়েও, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পড়তে পারো। কিন্তু হতে হবে বিজ্ঞানের স্নাতক। এমনকী অনেক ডাক্তারও এই কোর্স করে হাসপাতালের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আজকাল।

কেমন মাইনেপত্র এই পেশায়? শুরুতেই ৭০০০ থেকে ৮০০০ টাকা। বাড়তে থাকবে অবশ্যই। চাকরির সুযোগও বাড়ছে ক্রমশ। ভারতের নানা জায়গায়, আমাদের কলকাতাতেও বেড়েই চলেছে বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা। তাঁরা চাইছেন পেশাদারিত্ব। ডাক্তারের হাতে হাসপাতাল পরিচালনার ভার ছেড়ে দিচ্ছেন না কেউই। তাই হাসপাতাল ম্যানেজারদেরও কদর বাড়ছে হৈহৈ করে।

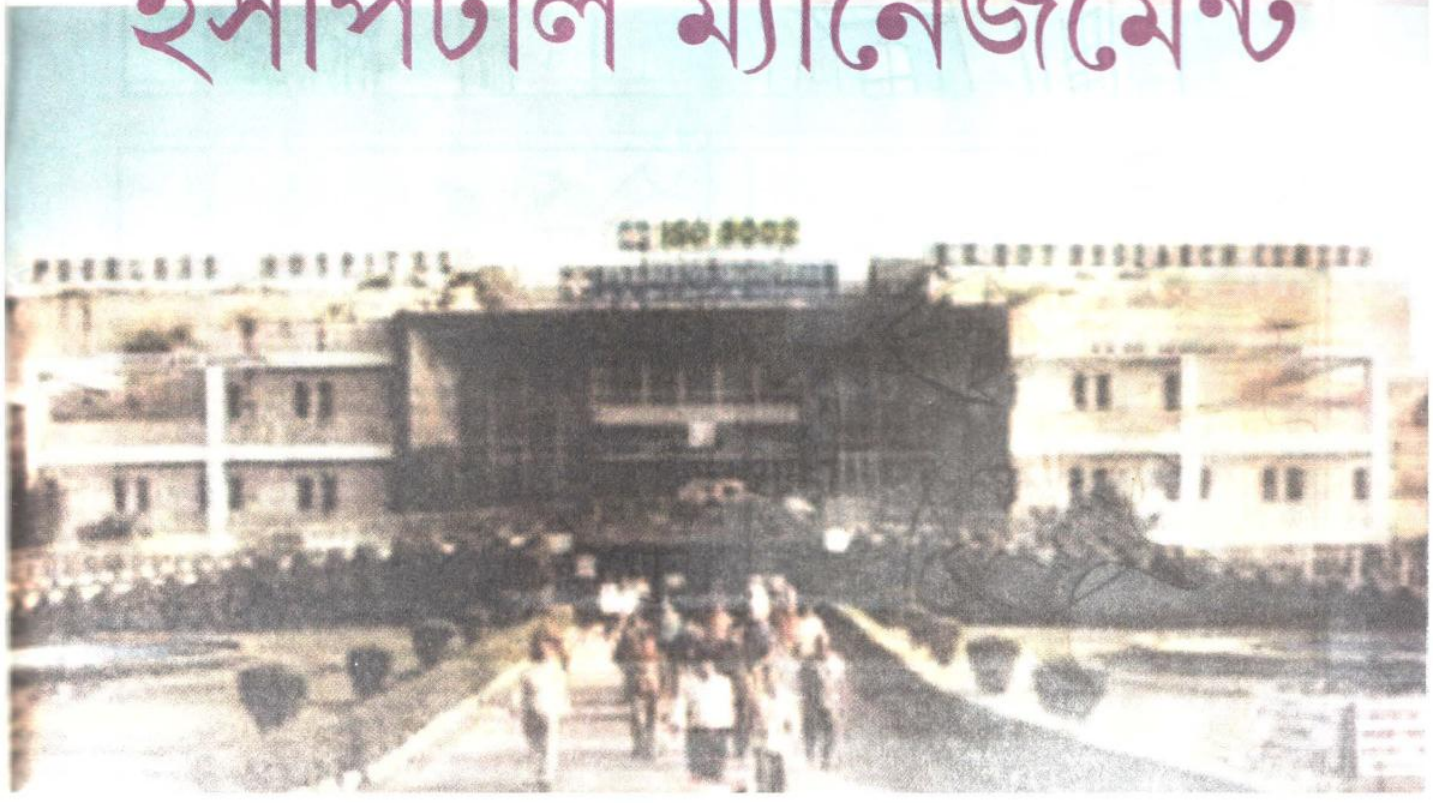

অতি বাড় বেড়ো না

চণ্ডী লাহিড়ি

বকাদের আমিই পথ বলে দিই!
নির্জন আকাশে
আমিই সন্ধ্যাতারার
সখী!
মেঘ ছাড়িয়ে আরও ওপরে!
ভয় করি
কালো মেঘকে!
সর্বনাশ!
বৃষ্টি!
এ যে কালবৈশাখী!

চাঁদের হাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যজিৎ রায় রবিশঙ্কর আলি আকবর খাঁ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লীলা মজুমদার সুবোধ ঘোষ বুদ্ধদেব বসু
অন্নদাশঙ্কর রায় মনোজ বসু কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অজয় হোম
মহাশ্বেতা দেবী রমাপদ চৌধুরী প্রতিভা বসু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মতি নন্দী শংকর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনিতা অগ্নিহোত্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
তসলিমা নাসরিন বুদ্ধদেব গুহ শৈলেন ঘোষ প্রফুল্ল রায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নবনীতা দেব সেন অশোক দাশগুপ্ত গৌরী ধর্মপাল কবীর সুমন
গোপালকৃষ্ণ গান্ধি মনোজ মিত্র দিব্যেন্দু পালিত কিশোর চট্টোপাধ্যায় শোভন সোম
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তারাপদ রায় উজ্জ্বল চক্রবর্তী সরল দে
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অমিতাভ চৌধুরী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গৌতম ঘোষ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
আবুল বাশার বাণী বসু কার্তিক ঘোষ চুনি গোস্বামী সঙ্কর্ষণ রায় অমিত চক্রবর্তী
সমরেশ মজুমদার দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পবিত্র সরকার শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
অজেয় রায় সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সুরজিৎ সেনগুপ্ত শিলাজিৎ
জয় গোস্বামী মৃদুল দাশগুপ্ত সব্যসাচী চক্রবর্তী তিলোত্তমা মজুমদার অনির্বাণ রায়
রেবন্ত গোস্বামী সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় যশোধরা রায়চৌধুরী শ্যামলকান্তি দাশ
প্রচেত গুপ্ত সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লব কীর্তনিয়া উল্লাস মল্লিক শ্রীজাত চন্দন নাথ
অলক চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী দীপ মুখোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ দেব রাজেশ বসু
সুনীত সেনগুপ্ত রাজশ্রী রাহা অতনু চক্রবর্তী চৈতি ঘোষাল গৌর বৈরাগী পিনাকী ঠাকুর
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় কঙ্কাবতী দত্ত ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সন্দীপ রায় সুজয় সোম

রেবতীভূষণ নারায়ণ দেবনাথ সমীর সরকার বিজন চৌধুরী রণেনআয়ন দত্ত
যোগেন চৌধুরী শুভাপ্রসন্ন চণ্ডী লাহিড়ি সুধীর মৈত্র নীতীশ মুখোপাধ্যায়
প্রণবেশ মাইতি যুধাজিৎ সেনগুপ্ত অমল চক্রবর্তী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
কৃষ্ণেন্দু চাকী দেবাশিস দেব অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় সমীর দাশ দেবব্রত ঘোষ

সন্দেশ

১৪১৩

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

আফ্রিকার জঙ্গলে

ভ্রমণ VCD
যখন খুশি ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চিত্রগ্রহণে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে
পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ

ঘরে বসেই দেখুন জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, হাতি, হরিণ, হায়েনা, জলহস্তি, চিতা, লেপার্ড ও আরও অনেক বিস্ময়কর পশুপাখির অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আদিবাসীদের নাচ-গান।

১ ঘণ্টার ভিসিডি। মাত্র ২০০ টাকা

AFRICAN WILDLIFE
through the lens of
Amarendra Chakravorty
A BHRAMAN VCD

মিউজিক ওয়ার্ল্ড, সিম্ফনি, অক্সফোর্ড বুক স্টোর, ল্যান্ডমার্ক, প্ল্যানেট এম ও সব ক্যাসেটের দোকানে পাবেন

ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা ১৯ ফোন ২২৮৩২৩২০ ফ্যাক্স ২২৪৭৬৪৪৮ ই-মেল swarna@cal2.vsnl.net.in

R N I No 12007/64

SANDESH • APRIL 2006 a bengali monthly for young readers Rs 10.00

Arambagh Hatcheries Ltd.

The only fully integrated poultry organisation in India.

Feed

Breeding Farm

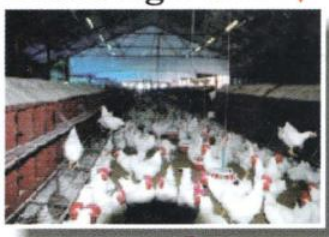

Retail Outlet

Hatching

Broiler Farm

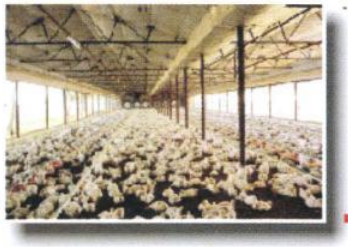

Processing

There is full traceability of its branded Chicken products right through the supply chain

SQF stands for- Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

HELP LINE

22832603 • 22832588 • 22814116

arambagh's chicken